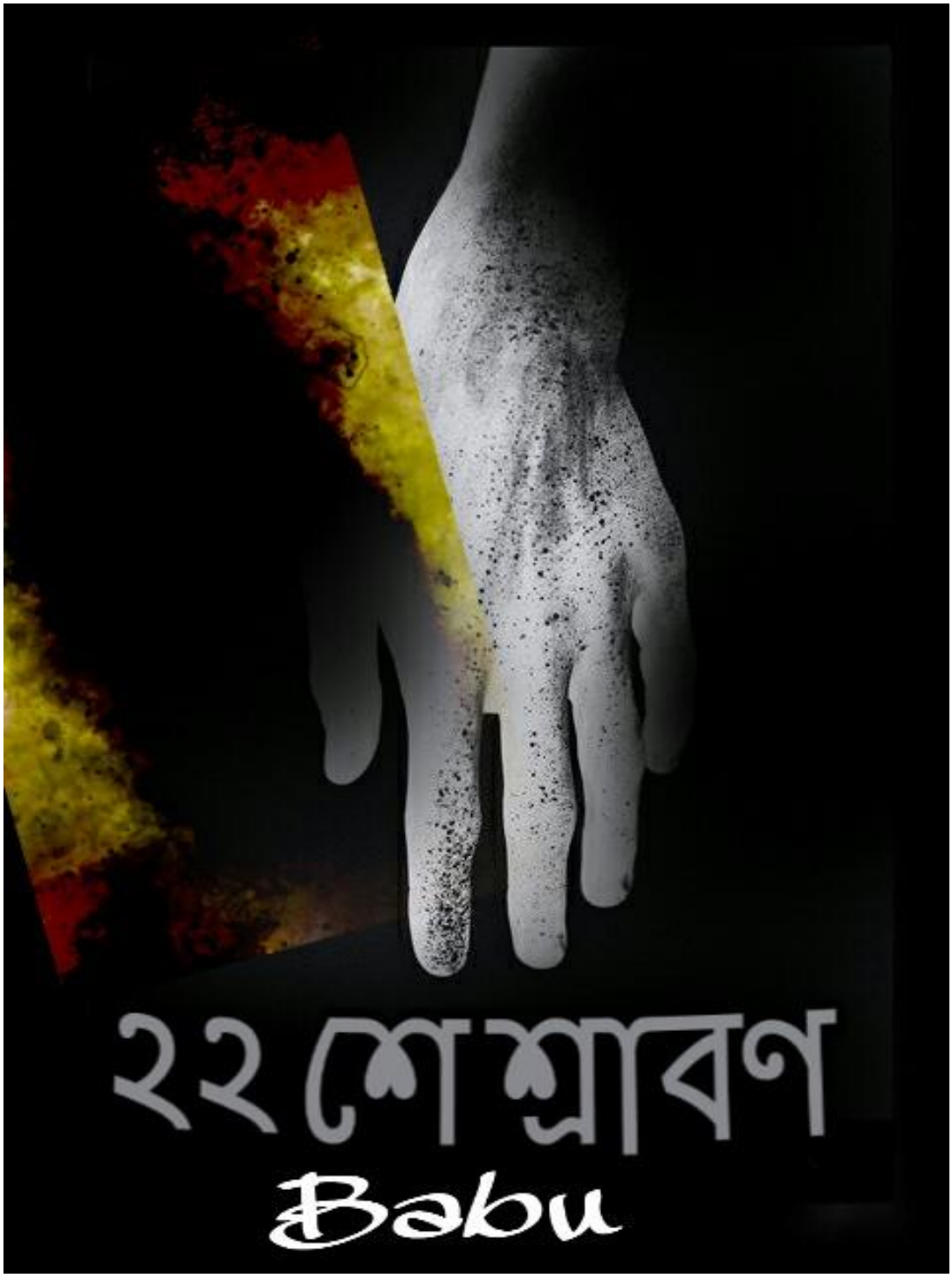
২২ শে শ্রাবণ
Babu

লেখাটা আসলে আমার একটা মূল গল্পের প্রারম্ভ। বলতে গেলে ডুলজির প্রথম পার্ট। আমার লেখার সবলতা আর দূর্বলতাগুলো জানার জন্য আমি এই গল্পটা পিডিএফ আকারে বের করেছি। গল্পটা অভ্র দিয়ে লেখা সে জন্য কিছু বানান ভুল আছে।

লেখাটি ভাল লাগলে আশা করি পিডিএফ লিংক সহ শেয়ার করবেন,রিভিউ দিবেন। এতে আমার আনাড়িপনা কমবে এবং ভবিষ্যৎ ভাল কিছু লিখবো।

ফিডব্যাক পাঠাতে পারেন

ইমেইলঃ mjbabu@yahoo.com

ফেসবুকঃ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026086784586

এক

সকাল সকাল ঘুমটা ভেঙে গেলো। প্রচণ্ড মাথা ব্যথা করছে। কাল ঘুমিয়েছি প্রায় ৩ টায়। সেমিস্টার ফাইনাল চলছে। ভালো করে পড়া হয়নি। ফেইল করার প্রবল সম্ভাবনা দেখছি। যদিও পাশ করি সেকেন্ড ক্লাস উঠবে কি না সন্দেহ আছে।

আমার বাবার মাঝেমধ্যেই মর্নিং ওয়াকে যাওয়ার ইচ্ছা হয়। কিন্তু সেটা প্রতিদিন এর রুটিন না ,বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে। মুহূর্তটা উনার জন্য ভালো বাকীদের জন্য খারাপ। বাবা কোর্ট মার্শাল খাওয়া নেভী অফিসার। আমার শ্রদ্ধেয় দাদাজান বিশাল সম্পত্তি আমার বাবা ব্যবসায় খুইয়েছেন। তারপর আর কি আমার আম্মা সমস্ত দায়িত্ব ঘাড়ে নিলো। স্কুল মাস্টারি করে দিন চালায়। অবশ্য বাবা মাঝেমধ্যে কিছু করে। কি করে সেটা বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের মধ্যে। সে হিসেবে বাবা বুদ্ধিজীবির শ্রেণীর মানুষ। আমার বাবা এসব ছোটখাটো কাজের জন্য জন্মায়নি। দেশকে আলোকিত করার জন্য জন্মিয়েছে। তিনি দেশকে নানাভাবে আলোকিত করছে। যেমন আজকাল বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলা নিয়ে বিশ্লেষণ করা শুরু করেছে। গত কয়েকদিন এর মধ্যেই উনার বিশ্লেষণের রেজাল্ট পাওয়া যাবে।

আজ উনার মর্নিং ওয়াকে যাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে বোধ হয়। দরজায় ধপাস ধপাস মিলিটারি কিল পড়ছে। বাবার সবকিছু আগেই 'মিলিটারি' শব্দটা উপাধি হিসেবে থাকে। যেমন মিলিটারি ধমক,মিলিটারি হাসি,মিলিটারি স্টাইলে চুরুট টানা ইত্যাদি।

এসব উপাধি আমার বড় ভাইয়ের দেয়া। বাবা মিলিটারি ছাড়ার আগ পর্যন্ত ভাইয়ার বয়স ছিল আট। মাঝেমধ্যে বাবা সম্পর্কে অদ্ভুত কথা শুনি ভাইয়ার কাছে।

দরজা না খুলা পর্যন্ত এই মিলিটারি কিল চলতে থাকবে। বাবা কতটা অধ্যবসায়ী ছিলেন তা জানি না,কিন্তু দরজার নক করার ব্যাপারে বাবা খুব অধ্যবসায়ী। দরজার নক করার সাথে সাথে বাবা আবার ওপাশ থেকে বলছে "এই উঠ ,সকাল ছয়টা বাজে আর কত ঘুমাবি।"

ধুপ ধুপ ধপাস স্টাইলে বাবা নক করছে। দরজা নক করার ও বিশেষ তাল আছে। দরজার নক করার পদ্ধতি শুনেই বুঝতে পারা যায় ওইপাশে কে। বাবা অনেকক্ষণ যাবত নক করছে। আমার উঠে যাওয়া দরকার। বাবার নক-নকানির গান আরও কিছুক্ষণ শুনা যাক। এখন এক কাপ চা ও কপালে জুটবেনা। তার থেকে বরং বাবা দরজায় নক করুক। তার আওয়াজ শুনে সবাই ঘুম থেকে জাগুক আগে। তারপর এক চাপ খেয়ে আরামসে দিন শুরু করবো।

" কুম্ভকর্ণ নাকি তুই। উঠ নাহয় এখন দরজা ভেঙে ফেলবো" বাবা তার মিলিটারি স্টাইলে বললেন। না,আর বিছানায় ঘুপটি বসে থাকা শ্রেয় হবে না। বাবার রাগের ঠিক নেই। সত্যিই সত্যিই না দরজা ভেঙ্গে ফেলে তার ঠিক নেই।

দরজা খুলে দেখলাম বাবা দাঁড়ানো। পরনে সাদা পাঞ্জাবি। আমার বাবার বয়স ৬২ ,এই বয়সের মানুষের সামনের চুল পড়ে যাওয়ার কথা। চুল পাকা ধরার কথা। যখন টেনশন লাগবে টাকে হাত বুলানোর কথা। কিন্তু উনার কোনটায় হচ্ছে না। না চুল পাকছে,না চুল ঝরছে। মাঝেমধ্যে ইচ্ছে করে বাবাকে ন্যাড়া করে দেয়,পিছনের চুলগুলা সাদা করে দেয়। তাহলে বোধহয় বাবা কে বাবা টাইপের মনে হত। বাবা আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখল।

"তুই কি আমার ছেলে?" বাবা বলল। বাবার মুখে এই প্রশ্নটা যতবার শুনেছি সেটার যদি হিসেব করতাম তাহলে মনে হয় একটা গিলগামেশ হয়ে যেত। কাব্যের নাম দেওয়া যেত "বাবার একটি প্রশ্ন?"

"চলেন আজই ডি এন এ টেস্ট করাবো। আপনার এই প্রশ্ন শুনতে শুনতে আর ভাল লাগেনা। সকাল সকাল ঘুম থেকে তুলেছেন এই প্রশ্ন করার জন্য।"

বাবা দরজায় হাত দিয়ে দাড়িয়ে আছে। বাবার চশমার ভিতরে দুখানা চোখ ট্রাকের হেডলাইটের মত চিলিক দিয়ে উঠলো।

"রসিকতা করছিস আমার সাথে?"

"বাবা ,এত সকালে কেন তুলেছেন?"

"তোর কাছে সকাল হয় নাই? ছয়টা বাজে রে বলদের বাচ্চা।"

আমার বাবা আফজাল হোসেন এখন এখানে দাঁড়িয়ে লেকচার দিবে। আমার বাবা অন্যদের থেকে আলাদা না। সন্তানদের নিয়মিত উপদেশ দিয়ে বাবা শ্রেণীর দায়িত্ব পালন করে থাকে। এই মুহূর্তে উনার নৈতিক বাণী শুনার কোন ইচ্ছা নেই আমার। মাথা টন টন করছে প্রচন্ড ঘুমে।

বাবাকে একটু রাগানো যাক। উনাকে রাগালে উনি চলে যাবেন। সারাদিন আমার সাথে কথা বলবেনা। খাবার টেবিলেও আসবে না। আমার রুমের পাশ দিয়ে গলা ঝাঁকি দিয়ে পায়চারি করবে। তারপর রাত হলে বসে জোরে জোরে জীবনানন্দ পাঠ করবেন। উনার এইগুলা বিশেষ পদ্ধতি এটেনশন পাওয়ার জন্য। যতক্ষণ না উনাকে স্যরি বলবো উনি এমনি করবে।

"বাবা এইটা কিন্তু হলো না। বলদ? এটা যায় না আপনার সাথে। আপনার মত বুদ্ধিমান একটা মানুষ বলদ হয় কি করে। আপনি তো শিম্পাঞ্জি শ্রেণীর কেউ। মানুষের সবচেয়ে কাছাকাছি জাত। ছিঃ বাবা তা বলে বলদ?"

বাবা আমার কথা শুনে লাল হয়ে গেলো তারমানে তার গরম হচ্ছে। বাবাকে রাগিয়ে দেওয়ার সুবিধা হল বাবা রেগে গেলে কিছু বলতে পারে না আর কিছু করতেও পারে না। শুধু গরম হয় আর লাল হয়।

"তুই আমাকে বলদ বললি আবার শিম্পাঞ্জি। তুই আমার ছেলে হয়ে এই কথা বললি কি করে?"

"বাবা আপনিই তো বললেন ,বলদের বাচ্চা"

বাবা কিছু বলল না। চলে গেলেন। এখন হয়ত আমার আম্মাজান বাবার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসবেন। স্বামীর জন্য দরদ মনে আম্মার অন্যান্য স্ত্রীদের থেকে বেশি। বাবার বয়স যখন পঁচিশ উনি বারো বছরের এক মেয়ের প্রেমে পড়েন। বাবা কুমিল্লায় স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন ট্রেনের জন্য। ট্রেন আসলো,বাবা উঠবে ঠিক এমন সময় আম্মা ট্রেন থেকে নামার জন্য দরজায় আসলেন। ঠিক এই মুহূর্তে আম্মার মুখোমুখি হলো আব্বা। বাবা প্রথম দেখার পর থেকে আম্মার প্রেমে হাবুডুবু খেলেন। বাবা আর ট্রেনে উঠলেন না। নেমে গিয়ে সোজা দাদাজানকে ধরলেন তাকে বিয়ে করানোর জন্য। আমার দাদা ওকালতির কারণে বিরাট সুনাম তার। অনেক সম্পত্তি করেছেন ওকালতি করে। বাবা আমার দাদাজানের একমাত্র সন্তান। সুতরাং পাশের গ্রামের ফজলুল করীমের মেয়েকে দু' দিন পর ই পুত্রবধূ করে আনে দাদাজান। কিন্তু উনার কপালে সুখ বেশি দিন জুটে নাই,দু মাস পড়ে উনি গত হলেন। বাবার কথামতে অতিরিক্ত সুখে উনি স্ট্রোক সেই জন্য নাকি মৃত্যুর পর ও উনার মুখে হাসি ছিল। সেই থেকে আমার বাবা নামক "পেইন" টা কে আমার আম্মা সহ্য করে আছে। আমার বাবাকে আমার আম্মা কোনদিন চোখ রাঙ্গিয়েছে কি না সন্দেহ আছে।

ঘড়িতে দেখি ছয়টা ত্রিশ। আজ ২২ শে শ্রাবণ। কবিগুরুর প্রয়ানদিবস। আজ তুমুল বৃষ্টি হবে। কবিগুরু বৃষ্টি হয়ে ১ দিনের জন্য পৃথিবীতে আসবেন। স্বর্গকে তো ৩৬৪ দিন মাতিয়ে রাখেন,১ দিনের জন্য নাহয় পৃথিবীতে আসুক।

এখন আর ঘুম আসবে না। রাতে ঘুম ভাঙলে ঘুম হয়,কিন্তু ভোররাতের ঘুম ভাঙলে হয় না। মাথা ব্যথা করছে,একটু ক্যাফেইন নেওয়া দরকার। বালিশের নিচে থাকা চিরকুট টাইপের চিঠিটা তুলে নিলাম। চিঠিটা দু দিন আগে বেনামি ঠিকানা হতে এসেছে। জানি কে পাঠিয়েছে। সারদা পাঠিয়েছে। আজ কয়েকদিন যাবত সারদার সাথে দেখা হয়নি। বলতে গেলে ইচ্ছে করে করিনি। মেয়েটার মাথায় উদ্ভট

চিন্তাভাবনা উঠে কয়েক দিন পর পর। সেইগুলা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আমার হিমশিম খেতে হই। কিছুদিন আগেই ম্যালেরিয়া হয়েছিল আমার। কারণ টা সারদা ছিল।

ক্লাস করছিলাম ,বলতে গেলে ঝিমচ্ছিলাম। হঠাত করে স্যারের আওয়াজ আসলো কানে। স্যারের আওয়াজ আসা মাত্রই দাড়িয়ে গেলাম।

" এই তোর প্রেমিকা আসছে। তোর নাকি খুব প্রয়োজন।ক্লাসে বসে জেগে থেকে স্বপ্ন দেখা লাগবে না। যা বের হ।"

স্যারের কথা শুনে সমস্ত ক্লাসে হাসির বন্যা ভয়ে গেল। প্রচণ্ড লজ্জা পেলাম। সেদিন জীবনের প্রথমবার মনে হলো লজ্জা পাওয়ার মত লজ্জা পেলাম। এতদিন যে নিজেকে নির্লজ্জ ভাবতাম সেটা আজ ভুল প্রমাণিত হলো।

আমি বের হয়ে দেখি সারদা বসে আছে। পরনে সাদা সেলওয়ার কামিজ। পরিচয় হওয়ার পর থেকে সারদাকে অদ্ভুত মনে হত।

কিছুদিন পর মনে হলো সারদা অদ্ভুত না রহস্যময়ী। অদ্ভুত এক মায়াজাল দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে। সারদার প্রিয় রঙ সাদা।

পহেলা বৈশাখীর দিন সবাই বিভিন্ন রঙ এর শাড়ি পড়ে আসলো,কিন্তু সেদিন সারদা সাদা শাড়ি পড়ে আসলো। সারাদিন সেদিন মুখে কালবৈশাখীর ঝড় নিয়ে বিধবার সাথে কাটালাম।

" আমার ক্লাস চলছিল। একটু অপেক্ষা করলেই পারতি। আর তুই স্যারকে কি বলেছিস? তুই আমার প্রেমিকা?"

সারদা আমার কথা শুনে হেসে উঠলো। আমি জানি না দেবী কিংবা অপ্সরীদের হাসি কেমন। কিন্তু আমার মনে হয় না সারদার হাসি থেকে সুন্দর হবে তাদের হাসি।

"স্যারকে যদি এটা না বলতাম স্যার তোকে আসতে দিতো?"

"তাই বলে এরকম করবি?"

"বাদ দে তো,আমার মাথায় একটা জম্পেশ আইডিয়া এসেছে ?"

"বইন আমাকে মাফ কর তুই" আমি বলে ক্লাসের দিকে রওনা করলাম।

সারদা এসে আমার হাত ধরলো। এই চার বছরে প্রথমবার সারদা আমার হাত ধরেছে। আমার হৃদপিন্ড মনে হলো জমে গেছে। কয়েক সেকেন্ডের জন্য মনে হলো সময় আমার জন্য থেমে গেছে। আমি সারদার হাতটা ঝাঁকি মেরে ছাড়িয়ে নিলাম।

সারদা নিজের হাতটাকে গুটিয়ে নিলো। দু' জন দু' জনের তাকিয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ।

"এত সেনসিটিভ হচ্ছিস ক্যান তুই। যে কোন মেয়ে ধরলেই কি সেনসেশন ফিল করিস নাকি?" নীরবতা ভেঙ্গে সারদা বলল। সেদিন ইচ্ছে হলো সবকিছু বলে দেই,কিন্তু বলা আর হলো না।

"কি বলতে চাইছিস সেটা বল?"

" আগে আয় আমার সাথে।"

বাংলাবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। মাথার উপর শ্রাবণের বৃষ্টিমাখা রোদ তীর্যকভাবে কিরণ দিচ্ছে। আষাঢ় পেরিয়ে শ্রাবণ আসলো তবুও মেঘের কোন আঁচর লাগেনি সূর্যের উপর। এবার সূর্যদেব ভীষণ রুষ্ট মর্ত্যবাসীদের উপর। তাইতো দেবরাজ ইন্দ্রকে একটুও ভ্রুক্ষেপ করছে না একটু। রোঁদে পুড়ে যাচ্ছি। তাই রিকশাওয়ালাকে বললাম "মামা হুডটা তুলে দেন একটু।"

রিকশাওয়ালা নেমেছে,হুড তুলবে এমন সময় সারদা বলল "এই হুড তুলবে ক্যান? তুই কি মতলব করছিস? তুই কি আমার প্রেমিক নাকি যে হুড তুলে রোমান্টিক কথা বলবি। মামা আপনি রিক্সা ছাড়েন। আর তুই নাম।"

"আরে রেগে যাচ্ছিস ক্যান?আমি তো শুধু সূর্যদেবের আগুন থেকে থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হুড তুলতে বললাম" রিক্সায় বসে থেকে বললাম।

সারদা আমার দিকে এমনভাবে তাকালো আমার মনে হলো স্বয়ং দুর্গা মহিসাশূরের দিকেও এমনভাবে তাকাইনি। কলিজা কেপে উঠলো।

"তুই নামবি না আমি চিৎকার করে মানুষ জড়ো করবো" ওর কথা শুনে রিক্সা থেকে নেমে গেলাম।

সারদা আমার সাথে এমন প্রথমবার করেনি। আরও কয়েকবার এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাকে। আমার পকেটে টাকা নেই। এখন হলে ফিরতে হলে পায়ে হেটে ফিরতে হবে। রিকশাওয়ালা কনফিউজড হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি সারদার দিকে তাকালাম। সারদা অন্যদিকে তাকিয়ে আছে।

"আমার পকেট তো খালি। কিছু টাকা হবে তোর কাছে?" সারদাকে বললাম। এই পর্যন্ত কত টাকা যে ওর থেকে চেয়ে নিয়েছি তা আল্লহয় জানে।

" না হবে না" সারদা জবাব দিল। বুঝলাম ওকে আর ঘাঁটানো আমার পক্ষে শ্রেয় হবে না তারচেয়ে বরং চলেই যায়। বাংলাদেশে নারীদের অনেক ক্ষমতায়ন হলেও এখনো রিকশাচালকরা পুরুষদের দিকে তাকিয়ে থাকে নির্দেশনার জন্য। এই খবরটা যদি নারীবাদী লেখক আর কলামিস্টরা জানে তাহলে তো রিকশাওয়ালাদের পেটে লাথি পড়বে।

"আচ্ছা মামা যান। ওকে রোকেয়া কামাল হলের সামনে নামাই দিয়েন।"

রিকশাওয়ালা ঘুরিয়ে রিকশা চালানো শুরু করলো। আমিও রিকশার পিছন পিছন হাটা শুরু করলাম। সেদিন মশারা আমার উপর স্পেশাল ভোজ করেছে। প্রায় দু ঘন্টা মশাদের অসংখ্য চুমু খেলাম। বংশাল টু জুহুরুল হক হল। মশাদের স্পেশাল ট্রিটমেন্ট পেলাম। ফলাফল প্রায় ২ সপ্তাহ বিছানায় পড়ে ছিলাম।

সেদিন ঠিক করেছি যদি কোনদিন আলাদিনের প্রদীপ পায় তাহলে ৩ টা উইশের মধ্যে একটা করবো সেটা হলো মশা থেকেও যেন ক্ষুদ্রতম

প্রাণী হতে পারি এবং মশাকে কামর বসিয়ে মশাদের মধ্যে জ্বর ছড়িয়ে দিতে পারি। সেদিন মশাদের মধ্যে নতুন আতংক হিসেবে মানুষের নাম উঠে আসবে।

দুই

স্পেশাল দিনে কোনকিছু ঠিক পাওয়া যায় না। যেমন শেভ করতে গিয়ে ক্রিম শেষ হয়ে যাওয়া,পাঞ্জাবি ময়লা থাকা,পাদুকা জোড়া ছেড়া থাকা ইত্যাদি ইত্যাদি। আজ ২২শে শ্রাবণ। সকালেই বাবার ঝামেলা দিয়ে শুরু হলো। আল্লাহয় জানে বাকী দিন করে কাটায়। রবীন্দ্রসংঘের উদ্দেশ্যে অনেক কর্মসূচি আজ নেওয়া হয়েছে। সকালে ছায়ানটের গানের মাধ্যমে দিন শুরু,দুপুরে স্মৃতিচারণ আর আলোচনা সভা ,সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ছায়ানটের অনুষ্ঠানে ৮ টার আগে গেলেই হবে। তার আগে হল থেকে একটু ঘুরে আসতে হবে নাস্তাটাও ওখানে সারা যাবে।

একের পর এক পাঞ্জাবি চেক করলাম। একটাও ভালো নেই। কোনটার বোতাম নেই,কোনটা আবার মুচড়ানো,কোনটার হাতা ঝুলছে আবার কোনটা থেকে দুর্গন্ধ আসছে। জানিনা পৃথিবীতে অলস আর ছন্নছাড়াদের জন্য কোন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় না কেন। অলিম্পিকে করলে ভালো হতো। বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করে হয়ত একটা সোনা এনে দিতে পারতাম। নিজের এই গুণটা এভাবে নষ্ট হচ্ছে সেটা ভাবতেই কষ্ট হয়।

পাঞ্জাবি ভাইয়া থেকে নেওয়া যেতে পারে। সদ্য বিবাহিতা বেচারাকে জাগানো ঠিক হবে কি না সেটা ভাবার সময় এক না। ভাইয়াকে জাগানো যাক,ভাবি দরজা না খুললেই হয়।

আমার আম্মা শিক্ষিকা তাই শিক্ষকতা পেশার প্রতি উনার অনেক ইজম। আমার গুণধর ভাই যার গুণ বলে শেষ করা যাবে না,শুধু দোষের অনেক অভাব আছে। ডাক্তারি পাশ করে এখন পরিবারকে দিনকে দিন ধনবান করছে। পরিবারের গরিবি সরাও-এই লক্ষে এগিয়ে যেতে যেতে উনি গরিবিকে রকেটে করে মঙ্গলে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আর মেবি কয়েকমাসের মধ্যে ব্ল্যাকহোলের মধ্যে গরিবিকে পাঠিয়ে দিবে।

ভাইয়া একদম বাবার প্রতিরূপ। সুদর্শন,চাইলে নায়ক হতে পারতো। দেশীয় চলচিত্রে নায়কের যা অভাব ভাইয়া গেলে কোন পরিচালক ই না করতে পারতো না। কিন্তু আফসোস এই মানুষটা জীবনে একটা প্রেম ও করেনি। প্রেম করলে হয়ত বউ খুঁজার এই ঝামেলা পোহাতে হতো না।

ভালো পাত্রীর সন্ধান করা ঢাকা থেকে শুরু হয়ে কুমিল্লা অবধি চলল। একে একে রূপবতী,গুণবতী,মায়াবতী আম্মার নজরের নিচে কচুকাটা হতে লাগলো। বাবা যেই মেয়েকে দেখে সেই মেয়েকে তার পছন্দ হয়ে যায়। এই নিয়ে আম্মা বাবাকে না বলেই অনেক মেয়েকে দেখলো।

ডাক্তার দেখলো কয়েক ডজন ,কিন্তু কেউ ই পছন্দ হলো না। অবশেষে ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষিকা মোসাম্মত রাবেয়া খাতুন লুবনাকে আম্মার পছন্দ হলো। অবশ্য বাবার কিছু অমত ছিল। কারণ লুবনা ভাবীর দেশের বাড়ি সিলেট। বাবা সেই কোনকালে সিলেটে তার বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল। তাকে নাকি খাবারে সকালে রুটি আর আলুভাজি,দুপুরে বেগুনভর্তা,টাকি মাছের ঝোল আর শিং মাছ দেওয়া হয়েছিল। এই দুবেলা খেয়েই বাবা বিকেলে বাড়ির পথে রওনা হয়। বাবার কথা মতে সিলেটিরা আপ্যায়ন করতে পারে না।

অথচ ভাইয়ার বিয়ের পর বাবার লো সুগার ছিলো,খাওয়ার ছুটে তা ক' দিনে বেড়ে চরমে। বাবাকে হসপিটালে ভর্তি হতে হলো। ভাবীর হাতের রান্নাও অসাধারণ লাগে।

ভাইয়ার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। বুঝতে পারছিনা নক করব না ডাক দিবো না আগের মত ঘুষি দিবো। না নক ই করি।

"ঠক ঠক" করে কয়েকবার নক করলাম। কয়েক সেকেন্ড পর ভাবী বলল "কে?"

তারমানে ভাইয়া এখনো ঘুমে। সুতরাং ওদের ডিস্টার্ব করেও লাভ নাই। পাঞ্জাবি আশা বাদ। বিয়ে হয়েছে কদিন হল। এখন যদি ভাইয়ার কাছে গিয়ে পাঞ্জাবি চাই, ভাবীর কাছে যতটুকু ইজ্জত আছে সেটাও হারাবো। তার চেয়ে বরং ময়লা পাঞ্জাবি পড়ে অপরিচিতদের কাছে ইজ্জত হারায় এটাই ভালো।

"ভাবী কিছু না" জবাব দিয়ে হাটা লাগালাম নিজের রুমের দিকে।

"এই দাড়াও,এদিকে আসো" একটু হাটার পর ভাবীর আওয়াজ শুনলাম। ফিরে দেখি ভাবী দাঁড়ানো দরজায়। কি আর করা। হেটে আবার ভাইয়ার রুমের সামনে গেলাম। ভাবির সাথে বলতে গেলে আমার কথা হয়েছে একদম কম। ভাইয়ার ও বিয়ে হলো আর আমার ও হলে ঝামেলা শুরু হলো। সারাদিন ক্যাম্পাসেই থাকতে হয়। ভাবীর মুখের দিকে তাকালে অনেকটায় মনে হয় আম্মা। দুজনের অনেক মিল। দুজনেই চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা পড়ে,দুজনেই অনেক মাথা সবসময় ডেকে রাখে আর স্পেশালি দুজনেই শাড়ি পড়ে সবসময়।

"এই সারাদিন কই থাকো বলো তো?বাসায় একদম দেখি না তোমায় আর তোমার এই অবস্থা কেন? চুলদাড়ির যা অবস্থা করে রাখছো মনে হয় কয়েক হালি ছেঁকা খেয়ে কাত হয়ে পড়ে আছো" ভাবী এক নিঃশ্বাসে সব বলল।

"একটু ব্যস্ত তো। সামনে সেমিস্টার তাই।"

"আচ্ছা ভিতরে আসো" ভাবী ভিতরে গেল। একসময় ভাইয়ার রুমেই বিনা সংকোচেই ঢুকে পড়তাম। আজ কেনও যে জড়তা কাজ করতে লাগলো। কারও অধিকার হরণ মাঝেমধ্যে কিছুর প্রতি অসংকোচের কারণ। আজ তা বুঝতে পারলাম।

"আরে আসো তো। সমস্যা নেই" ভাবী ভিতর থেকেই বলল।

ভাবী টেবিলে বসা। চোখের সামনে বিশাল খাতার স্তূপ। আমি এগিয়ে গিয়ে জড়সর হয়ে বিছানার কোনে বসলাম।

"গুড মর্নিং' '

"গুড মর্নিং ভাবী"

"বুঝছো,পরিক্ষার খাতা দেখছি সারারাত ধরে। তোমার ভাইয়াও রাতে ডিউটি করছে আর আমিও সারারাত যাবত খাতা কাটছি।"

"তাহলে তো ভাবী অনেক প্যারায় আছেন।"

"আমার কথা বাদ দাও। তুমি বলো এত সকাল সকাল ভাইয়ার খোঁজ করছো কেন?" ভাবী আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো।

কি বলব তাই না নিয়ে ভাবছি।

"টাকা লাগবে?"

" না ভাবী।"

"তাহলে?"

"কিছু না ,এমনি আসলাম।"

"তুমি তো এমনি এমনি আসো নাই। এত সকালে খুব প্রয়োজন না হলে আসতা না" ভাবীর চোখ সরু হয়ে আসলো। উনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। উনার হয়ত ধারণা আমি উনার দিকে তাকিয়ে মিথ্যে বলতে পারবো না।

"আপনাদের খোঁজখবর নিতে আসলাম।"

"খোঁজখবর কি কেউ সকাল সারে ছয়টায় নেয়?"

ধরা খেয়ে গেলাম।

"তুমি আমার ছোটভাই বুঝছো। নিজের বোন থেকে কিছু চাইলে তা বলতে হয়। না বললে আমি বুঝবো কি করে বলো।"

ভাবীর কথা শুনে আবেগি হয়ে গেলাম। আমার অন্যতম সমস্যা এই আবেগ। অল্পতেই হয়ে যায়। আবেগের ক্ষেত্রে একদম পাতলা ছেলে আমি।

" ভাবী আজ ২২শে শ্রাবণ তো। অনুষ্ঠান ছিল তো। আমার একটা পাঞ্জাবিও ভালো নেই তাই আসছিলাম ভাইয়ার কাছে পাঞ্জাবির জন্য" কথাটা বলেই ঢোক গিলে ফেললাম।

ভাবী আমার কথা শুনে মিষ্টি হাসি দিলো। খাতা দেখা অফ করে দিয়ে আলমারির কাছে গেল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ভাইয়ার সব পাঞ্জাবি এনে বিছানায় রাখলো। অধিকাংশ পাঞ্জাবি নতুন।

" এই নাও,যেটা ইচ্ছে হয় নিয়ে যাও" ভাবী বলল।

আমার বয়স প্রায় ২৩। এই ২৩ বছরে আমি বোধ নিজের পছন্দের কিছুই কিনি নাই। এক তো কালার ব্লাইন্ড আমি অপরদিকে পছন্দ খুব বাজে। আগে ভাইয়া কিনে দিত,তার আগে বাবা আর এখন সারদা। এত পাঞ্জাবির মধ্যে কোনোটা নিবো তা নিয়েই ভাবছি।

"নীলটা নাও। কালো ছেলেদের নীলে ভালো লাগে"

ভাবীর কথামত সুবোধ বালকের মত নীলটা তুলে নিলাম।

"ভাবী তাহলে উঠি।"

"শেভ করে যেও।"

"হুঁ"

তিন

ভার্সিটি লাইফে বন্ধুত্বটাকে কিভাবে ডিফাইন করবো সেটা নিয়ে অনেক ভাবছি। আসলে বন্ধু মানে কি সেটাই ভাবার বিষয়। বন্ধু যে প্রক্সি দিয়ে দেয় না পরিক্ষার আগের রাতে শিট সাপ্লাই করে। না যে সিগারেটে ভাগ বসায়। যদি বন্ধু এমন হয় তাহলে আমার একজন বন্ধু আছে। হাকিম ,পৃথিবির অন্যতম একজন গরীব মানুষ। সে মাসের প্রথম তারিখ থেকে টাকা ধারের জন্য লোক খুঁজতে থাকবে। একবার টাকা পেলে সেই টাকা পরিশোধ করার সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ। জহুরুল হক হলের ১১১ নাম্বার রুম তার আর আমার। বড় ভাইদের বিশেষ কল্যাণে দুজনে একসাথে সিট পেলাম,একই রুমে একই ডিপার্টমেন্টে হওয়া সত্যেও।

হাকিমের সাথে পরিচয় হয় আমার ক্লাসের প্রথমদিন। আমি অসহায় এর মত বেঞ্চের এক কোনায় বসে সবাইকে দেখছিলাম। নীরব অবজার্ভেশন এর দায়িত্বটা আমি খুব ভালোভাবে করতে পারি। সেটাই করছিলাম এক কোণায় বসে সুবোধ বালকের মত সবাইকে অবজার্ভ করছিলাম। আগে জানতাম না অবজার্ভেশন নামক জিনিসটা ইম্পোর্ট্যান্ট। স্যার সাত ক্লাস নিয়ে একদম ধরিয়ে দিয়েছে সেটা কত ইম্পোর্ট্যান্ট।

সবাইকে অবজার্ভ করছিলাম এমন সময় দেখি ক্লাসে একটি রোগা পাতলা গৌর বর্ণের ছেলের ঢুকল। গায়ে বেগুনি শার্ট আর কালো জিনস। সমস্ত ক্লাসের দিকে একবার চোখ বুলালো। তারপর আস্তে আস্তে পা ফেলে আমার দিকে আসতে লাগলো। তাকে দেখার জন্য আবার অনেকে মাথা ঘুরিয়ে তাকালো।

ছেলেটি আমার দিকে পাশে এসে দাঁড়ালো। সে আবার ঘাড় ঘুরিয়ে সবার দিকে চোখ বুলালো। তার চোখে পড়া থেকে বাঁচতে অনেকে এলিয়েন দৃষ্টি দেওয়া বন্ধ করে স্বাভাবিক কাজে মনোযোগ দিল।

ক্লাসে যখন আমি ঢুকি আমার দিকেও সবাই এমন দৃষ্টি দিয়েছিল। অবশ্য আমার কোন খারাপ লাগেনি। জীবনের প্রথমবার এত এটেনশন পাচ্ছিলাম।

"একটু চাপেন ,বসবো" এই বাক্যের মাধ্যমে পরিচয় হয় হাকিমের সাথে। প্রথমদিন আপনি ,দ্বিতীয় দিন তুমি আর তৃতীয়দিন সোজা তুই তে চলে গেল।

দরজায় নক করলাম। এত সকাল উঠার কথা না ওর। আজ শনিবার ,লাইব্রেরী বন্ধ। নাহয় ছয়টা না বাজতেই সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে যেত হাকিম। বন্ধের দিন সুতরাং আজ দুপুর পর্যন্ত ঘুমাবে হাকিম। এই সামান্য টোকায় তার ঘুম ভাঙ্গবে না বাবার মিলিটারি স্টাইলে কিল দিতে হবে।সুতরাং শুরু করলাম মিলিটারি কিল।

"ধুপ ধুপ" আওয়াজ হচ্ছে। বাবার মত হচ্ছে না। বাবার থেকে এ বিষয়ে ট্রেনিং নিতে হবে। আমি দরজায় কিল দিতে লাগলাম। কয়েক মিনিট পরই মনে হচ্ছে ধৈর্যের বাঁধন ভেঙ্গে যাবে। অধ্যবসায়ের অভাব। আবার কয়েকবার কিল দিলাম। না ,এবার কাজ হয়েছে। হাকিমের পাদুকার আওয়াজ শুনা যাচ্ছে।

"এত সকালে তুই?" দরজা খুলে চোখ কচলাতে কচলাতে হাকিম বলল। আমি ভিতরে গেলাম। লাইট অন করে বসলাম। হাকিম এবার ভালো করে তাকালো আমার দিকে। ভাইয়ার পাঞ্জাবির দিকে হাকিমের লোভাতুর নজর। আমার দরকার কিছু দিয়ে পাঞ্জাবিকে ঢেকে সেটার ইজ্জত রক্ষা করা। পাঞ্জাবির যদি মুখ থাকতো তাহলে বলতো "আমাকে এই পাষণ্ডের কু দৃষ্টি থেকে রক্ষা করো ঈশ্বর।"

"যখন আমি পাঞ্জাবি চাই তখন তো সব পুরান পাঞ্জাবি এনে সামনে দাও। আর যখন নিজে পড়ো তখন তো সব ইম্পোর্টেড পড়ো" হাকিম বলল। এখনো আমার পাঞ্জাবির দিকে তার নজর। আমার উচিৎ যত দ্রুত কেটে পড়া। নাহয় তার কু দৃষ্টিতে পাঞ্জাবির সম্ভ্রম ক্ষত-বিক্ষত হবে।

"হলের ঝামেলা শেষ হইছে?"

"হলের ঝামেলা ছড়েন ,আগের নিজের ঝামেলা সামলান। সারদা আপনাকে পাগলের মত খুঁজতেছে। কাল রাতে এসে আপনার বাসার এড্রেস নিয়া গেছে।"

ওই ঘটনার পর থেকে সারদার সাথে আমার আর দেখা হয়নি। ইচ্ছে করেই ইগনোর করছি ওকে। ওর সাথে দেখা করা দরকার।

"তুই ঘুমা,আমি যাই তাহলে।"

"এত সেজেগুজে কই যাচ্ছিস?"

"আজ ২২ শে শ্রাবণ" হাসি দিয়ে বের হলাম। জহুরুল হল থেকে হেটেই রওনা দিলাম রোকেয়া হলের উদ্দেশ্যে। ঘুরে যাবো একটু। শহীদ মিনারের সামনে আসলাম। একটা সিগারেট দরকার। পকেটে খরা চলছে। শহীদ মিনারে উপরে পা ঝুলিয়ে এক মধ্য বয়স্ক লোক সিগারেট টানছে। ওর থেকেই সিগারেট এর ব্যবস্থা করা যাক।

পৃথিবীতে অনেক কিছুর বৈষম্য রয়েছে। উপরওয়ালা সবাইকে সবকিছু সমান দেয় নি। আর সুখের বৈষম্যটা সৃষ্টিকর্তা খুব যত্ন করে,ভালোভাবে মানুষকে দিয়েছে। আমার সামনে বসা মানুষটিকে এই মুহূর্তে একজন সুখী মানুষ মনে হচ্ছে। সুখী মানুষদের মাঝেমধ্যে দুঃখী করে পৈশাচিক আনন্দ পাওয়া যায়। আজ সকালে যেমন বাবাকে করে পেলাম। লোকটার পরনে একটা ময়লা শার্ট,লুঙ্গি পড়ে আছে।

কোমরে আবার গামছা বাধা। রিকশাওয়ালা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সিগারেট টানা অফ করে আপাতত আমাকে দেখছে।

"এই ব্যাটা তোর সাহস তো কম না। বেদীতে বসে সিগারেট খাচ্ছিস। তোকে এখুনি থানায় ঢুকাবো আমি" চোখের দিকে চোখ রেখেই বললাম।

ভাবছিলাম চমকে উঠবে অথবা ভ্যাবাচ্যাকা খাবে। কিন্তু কিছুই হল না অন্যদিকে তাকিয়ে আবার সিগারেটে টান দিল।

এমন অবহেলা বোধ সারদা ও আমাকে করে না। নিজের মধ্যে সিরিয়াসনেস এর অনেক অভাব।

"মামা পকেটে কিছুই নাই। ফাঁপর দিয়া লাভ নাই। এক পয়সাও হইবে না আমার কাছে। তার থাইকা বরং শহীদ মিনারের পিছনে একজন হাগতাছে ওরে ধরেন কাজে দিবে।"

এই রিকশাওয়ালাকে আর কিছু করার মত রাস্তা নাই। আমাদের বাংলাদেশে শহিদ মিনার নামক একটা জিনিস আছে যেটাকে ৩৬৪ দিন কোরবানি করা হয় আর একটি দিন শুধু সম্মান দেওয়া হয়।

"মামা একটা সিগারেট দেন" চেয়েই নিলাম। আমার কথা শুনে লোকটি পকেট থেকে সিগারেট বের করে দিলো। এই সিগারেট টা যদি কোন কর্পোরেট,অথবা পাবলিক সার্ভেন্ট অথবা বড়লোক ব্যবসায়ীর নিকট চাইতাম ওরা কি দিতো? জানা দরকার। একদিন কোন অপরিচিত এলিটকে ধরতে হবে একটি সিগারেট এর জন্য। অক্টোপাসের মত ধরে সিগারেট আদায় করতে হবে। দরকার হলে লাখো লাখো ধূমপায়ীদের দোহায় দিতে হবে। তবুও এলিট শ্রেণির কারও থেকে সিগারেট নিতে হবে। ওদের সিগারেট টেনে দেখতে হবে সেটার স্বাদ কেমন।

"মামা আপনার বাড়ি কই?"

"শেরপুর।"

"কি করো?"

"রিকশা চালায় মামা।"

"কত বছর ধরে ঢাকায় আছো?"

"ধরেন সাত বছর।"

"মামা তোমার কাছে আমি ঋণী। একটা সিগারেট পাওনা আছো তুমি।"

লোকটি আমার কথা শুনে হাসি দিলো। সেটা ছিলো একদম নির্ভেজাল হাসি। কোন কপটতা ছিলো না হাসিতে। সব মানুষ মন খুলে হাসতে পারে না। এই মানুষটার মন খুলে হাসার ক্ষমতা আছে।

আজকের দিনে প্রবল বৃষ্টি হওয়ার কথা। ২২শে শ্রাবণ বৃষ্টি না হলে কবিগুরু পৃথিবীতে এসেও হতাশ হবেন। কিন্তু আকাশ একদম ফকফকা। মেঘের কোন আভাস নেই আকাশে। আকাশকে আজ

কাঁদতে হবে। নাহয় কবিগুরু রুষ্ট হয়ে সর্গে ফিরে যাবে। তখন কি হবে? স্বর্গবাসীরা তো বিপদে পড়বেন। কবিগুরু আর গান করবে না,কবিতা লিখবে না ছোটখাটো আসরের ও আয়োজন করবে না। হে ঈশ্বর আজ না হয় স্বর্গবাসীদের খাতিরে বৃষ্টি হয়।

চার

সারদাকে খবর দেওয়ার জন্য বরাবর আমাকে দারোয়ানের আশ্রয় নেওয়া লাগে। গত কয়েক বছরে দারোয়ানের পকেটে অনেক টাকায় গেছে উৎকোচ হিসেবে। আজ ও তা করতে হবে,তবে আজ টাকা নেই।

দারোয়ান আমাকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেল। গেট থেকে রাস্তায় এগিয়ে আসলো। যাক,ব্যাটার বোধহয় আজ আমার প্রয়োজন পড়েছে।

“সারদা দিদি তো হলে নাই” ব্যাটা দাঁতকপাটি বের করে বলল। মনে হচ্ছে খুব বড় সুসংবাদ দিয়েছে।

“ কই গেছে ? কিছু বলে গেছে?”

“হল থেকে কাল রাইতেই তো বের হইছে। এহনো ফিরে নাই। তবে যাওয়ার আগে একটা চিঠি দিয়ে গেছে আফনের জন্য” দারোয়ান পকেট থেকে চিঠি বের করে দিলো। সারদার দেওয়া চিঠি,চিঠি বললে ভুল হবে চিরকুট চিঠি। চিঠির খামের উপর কিংবা চিঠির সামনে পিছনে কিছুই লেখা থাকেনা। সাদা পেজে মাঝ বরাবর লেখা থাকে।

“আচ্ছা ধন্যবাদ মামা” বলে চলে যাচ্ছিলাম।

“মামা একটু দাঁড়ান” দারোয়ানের আওয়াজ শুনে আবার ফিরলাম। দারোয়ান হলের ভিতরে ঢুকে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা ব্যাগ নিয়ে বের হয়ে আসলো।

“এই নেন মামা। এইটা আপনার জন্য রেখে গেছে” ব্যাগটা আমার হাতে দিয়ে দারোয়ান বলল। ভেবেছিলাম চিঠিটা পড়বো না আজ। কিন্তু এখন পড়তে হবে। তার আগে ব্যাগে কি সেটা দেখতে। চটের একটি মাঝারি ব্যাগ। ব্যাগ এর উপর লেখা “প্লাস্টিক বর্জন করি,পরিবেশ রক্ষা করি” ব্যাগের ভিতর তাকিয়ে দেখলাম এক গাদা বই।

প্রথম বই “নৌকাডুবি” । প্রথম বইটা বের করলাম। দ্বিতীয় বইয়ে দেখি “ঘরে বাইরে” ,আর উল্টিয়ে দেখলাম না। যে কয়েকটা বই আছে সবগুলি রবীন্দ্রনাথের। চিঠিটা খুললাম,

বইগুলি এই এড্রেসে পৌছিয়ে দিস,বাসা-১২ /বি,রোড নং -৭,বি ব্লক উত্তরা। যাতায়াত খরচ বাবদ পাঁচশত টাকা দিলাম।

সারদার চিরকুট। আটকে গেলাম মনে হয়। সারাদিন কিছুই করা হবে না। উত্তরা যেতে লাগবে ৩-৪ ঘন্টা। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে মনে হয় ফেঁসে গেলাম। কবিগুরুকে এখন আমাকে মুক্তি দিতে হবে।

আশেপাশে কোন রিকশা দেখছিনা। এইগুলা নিয়ে শাহবাগ হেটে যাওয়া সম্ভব না। রিকশা দরকার। এখানে পাওয়া যাবে না একটু সামনে এগুতে হবে।

সামনে দুজন তরুণ তরুণী বসে আছে। তাদের কাছে একটু অপরিচিত হওয়ার ভাব নিয়ে রিকশার সুবিধা ভোগ করা যাক। ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীদের দয়া-মায়া দুইটাই প্রয়োজনের থেকে বেশি। গ্রাম থেকে কেউ আসলে তার জন্য কলিজা বের করে দেয়। ভর্তি পরিক্ষার্থীদের রাতে থাকার ব্যবস্থা করতে গিয়ে অনেককেই রাত পার করতে হয় খোলা মাঠে কিংবা হলের বারান্দায়।

পকেটে টাকা নেই তবুও বাবা অথবা বড় ভাই আসলে হলের ক্যান্টিন থেকে না খাবার খাইয়ে বাহিরে খাবার খাওয়ায়।

তরুণ তরুণীর কাছে গিয়েই বুঝলাম জুনিয়র। মেয়েটি বসে আছে। তার হাতে একটি বাটি। আরেকটু কাছে গিয়েই বুঝলাম। হাতে খাবারের বাটি। মেয়েটি নিজ হাতে ছেলেটিকে খাইয়ে দিচ্ছে। হয়ত মেয়েটি কাল রাতে হলে কিছু ভালো রান্না করেছে। সেখান থেকে কিছু হয়ত ছেলেটির জন্য তুলে রেখেছে। নাহয় বাড়ি থেকে ফিরতে ছেলেটির জন্য লুকিয়ে নিয়ে নিয়ে এসেছে। ছেলেটিও মাথা নিচু করে খাচ্ছে। আমাকে দেখে মেয়েটি মাথা নিচু করে ফেললো। তাদের এই মুহূর্তটাকে নষ্ট করতে ইচ্ছে হলো না। হয়ত এই একটি মুহূর্তের প্রতিদান দিতে গিয়ে ছেলেটি কখনো মেয়েটির হাত ছাড়বেনা। মেয়েটি হয়ত এই ভালবাসার কথা চিন্তা করে ছেলেটির হাত ছাড়বে না। সম্পর্কে ভালবাসার থেকে অনেক সময় বেশি গুরুত্ব হয়ে উঠে কিছু মুহূর্ত, সময় অথবা অবস্থা। ভালবাসাটা

হয়ত সবসময় এক রকম থাকে না কিন্তু মানুষ তাদের ভালবাসার মুহূর্তগুলোর কথা ভেবে তাদের ভালবাসাকে আবার পুনর্জীবিত করে।

ওদের দেখে সারদার কথা মনে পড়লো।

ক্লাস করছিলাম। এ্যাডাম স্যারের ক্লাস। সব মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছিল। প্রহর গুনছিলাম কখন সময় যাবে। মাঝেমধ্যে ১ ঘণ্টাকে মনে হয় ১ বছর। সেই সময়টা ওই ঘণ্টায় স্থির হয়ে থাকে। স্যারের হাত থেকে বাঁচার জন্য চোখে কালা চশমা লাগিয়ে ঘুম দিলাম। চোখে চশমা লাগিয়ে ঘুমানোর পদ্ধতিটা শিখেছিলাম রবিউল ভাইয়ার থেকে। উনিই এই পদ্ধতির আবিষ্কারক। নীলক্ষেত থেকে ৭০ টাকা খরচ করে চকচকা একটি কালো চশমা কিনলাম। স্যার যখন ক্লাসে ঢুকবে তখন চশমা পড়ে থাকবে।

যদি স্যার জিজ্ঞেস করে চশমা পড়ে কেন আছো? তাহলে উত্তরে বলতে হবে ভাইরাস আক্রমণ করেছে অথবা চোখ উঠেছে। ভাগ্যিস গত ৪ বছরে একবার ও কোন স্যার জিজ্ঞেস করেনি। কিন্তু একবার ম্যাডাম জিজ্ঞেস করেছিল। সেদিন বেঁচে গিয়েছিলাম মিথ্যে বলে। তারপর থেকে ওই ম্যাডামের ক্লাসে চশমা আমার পাঞ্জাবির পকেটে থাকে। প্রথমত অবশ্য মাইনোরিটির কাতারে ছিলাম। তবে আজকাল অনেকেই ফলো করছে এটা। চশমা লাগিয়ে টেবিলে পিঠ ঠেকিয়ে স্যারদের দিকে তাকিয়ে ঘুমানো। তবে সবার জন্য এটার প্রয়োজন হয় না। মেহেদী তো চোখ খুলা রেখেই ঘুমাতে পারে। সেই জন্য ওর ডাক নাম মেহেদি মাছ।

স্যারের দিকে তাকিয়ে এমন ঘুম দিয়েছি যে কখন ক্লাস শেষ হয়ে ছুটি হয়ে গেছে সেটার ও খেয়াল করিনি। চোখ যখন খুললো দেখি একজোড়া ঘন কাজল দেওয়া চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। লাফ দিয়ে উঠলাম। সারদা আমার লাফ দেখা দেখে খিল খিল করে হাসি দিলো। ওর হাসি ক্লাসরুমের প্রতিধ্বনি হয়ে আবার কানে আসতে লাগল।

“ভয় পেয়েছিস নাকি?”

"ভয় পাবো না ক্যান। কখন আসছিস আর কতক্ষণ ধরে বসে আছিস আমার সামনে?"

সারদা কোন জবাব দিল না শুধু আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। মেয়েদের স্টকে অনেক রকমের হাসি থাকে। ওরা সময় আর অবস্থা বুঝে ডেলিভারি দিতে পারে। যেটা ছেলেরা পারে না। এই যেমন সারদা এখন মুচকি হাসি দিলো,যেটা রহস্যময়ী হাসি।

"তুই বাচ্চাদের মত ঘুমাস ক্যান?"

"বাচ্চাদের মত মানে? আমি আমার মত ঘুমাই।"

"তুই বাচ্চাদের মতই ঘুমাস।"

সারদার সাথে তর্ক করে লাভ নাই। সারদার সাথে তর্ক করে কেউ পারবে না। ওর তর্ক করার বিশেষ যোগ্যতা আছে। দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি ২.২০ বাজে। তারমানে টানা দুই ঘন্টা ঘুমিয়েছি। টিউশনিতে যেতে হবে। গত কয়েকদিন ধরে টিউশনিতে যাওয়া হয় না। ছাত্রের মা এমনি বিরক্ত।

" কি ,যা বলার বলে ফেল। সময় নেই। টিউশনিতে যেতে হবে।"

"দুপুরে লাঞ্চ করেছিস?"

"না,ঘুমিয়েছিলাম। পরে করবো, চল বের হয়" আমি ব্যাগ গোছাতে লাগলাম।

"একটু বস,লাঞ্চটা করে যা" সারদা একটি টিফিন বক্স সামনে রাখল। বক্সটা খুলল। সর্ষে ইলিশ,পুরো ক্লাসেই সুভাস ছড়ে গেলো।

"তুই রেঁধেছিস নাকি?"

"হুঁ"

"তুই রাঁধতেও পারিস" ব্যাঙ্গ করে বললাম। সারদা মন খারাপ করে ফেলল। সারদার মন বুঝা দায়। কখন ও রসিকতাকে সিরিয়াস নিয়ে ফেলে সেটা বুঝা মুশকিল। টিফিন বক্স ঠাস করে বন্ধ করে বলল,

"তোর খেতে হবে না যা।"

বুঝলাম,আমার সর্ষে ইলিশ খাওয়া হুমকির মুখে।

“এত কষ্ট করে রেঁধেছিস আমার জন্য এখন আমি.....” কথা শেষ করতে পারলাম না। সারদা হাত দিয়ে থামিয়ে দিলো। “কে বলছে তোর জন্য আমি রান্না করেছি। আমার বয়েই গেছে” বক্স আবার খুলে বেঞ্চে রাখল।

“আচ্ছা বোস তুই হাত ধুয়ে আসি।”

“তোর হাত ধুতে হবে না,আমি খাইয়ে দিচ্ছি।”

সেদিন সারদা আমাকে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছিল। প্রত্যেকটা লোকমা অমৃতের মত ছিল। সেই মুহূর্তটা আমি বোধহয় জীবনে কখনো ভুলতে পারবো না। ব্রেইন ফাংশন অফ করে দিলেও আত্মা ঠিক মনে রাখবে। যদি বেহেশতে কখনো আমার আত্মা যায় তাহলে বোধ সারদার হাতের সর্ষে ইলিশ ক্ষাওয়ার জন্য আবদার করবে।

পাঁচ

আওয়ামীলীগ আন্দোলন করছে তাদের গ্রেপ্তারকৃত নেতাকর্মিদের মুক্তির দাবিতে। ক্ষমতাসীন দলের কোন টনক নড়ছে না। আজও শাহবাগে আওয়ামীলীগের নেতা-কর্মীরা জড়ো হচ্ছে আন্দোলনের জন্য। ঝামেলা শুরু হওয়ার আগেই আমার কেটে পড়া উচিত। বাস থেকে ভালো হবে সি এন জি। আরাম করে যাওয়া যাবে। নতুন জিনিস ঢাকা শহরে আসছে। চলতে অবশ্য খারাপ না। টাকা যেহেতু আছে একটু আরাম করে যাওয়া যাক। সিগন্যাল ছেড়েছে। হাত দিয়ে ইশারা করা শুরু করলাম। কয়েকটা বাস সামনে দিয়ে গিয়ে সামনে থামছে। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা বোধ সিএনজির এলাকা। দেখতে দেখতে একটি সিএনজি আমার সামনে এসে দাঁড়াল। ড্রাইভার মাথা বের করে বলল "কই যাবেন?"

ড্রাইভারকে আমার কাছে ড্রাইভার থেকে জল্লাদ বেশি মনে হচ্ছে। মুখের উপর কালো পাঞ্জাবি গোঁফ। মনে হচ্ছে গোঁফের প্যাঁচেই ফেলে দিয়ে কুপোকাত করে দিতে পারবে। এমন গোঁফ আমার সোবহান চাচার। বিশাল গোফ,ছোটবেলায় এই গোফ দেখেই ভয় পেয়ে যেতাম।

সোবহান চাচা কুমিল্লায় আমাদের দাদার সমস্ত সম্পত্তি দেখেন। বাবা সর্বসান্ত হওয়ার কয়েক বছর পর বাবা জানতে পারে দাদার বিশাল এম্পায়ার এর কথা। দাদা আর সোবহান চাচার বাবা একসঙ্গে ব্যবসা শুরু করেন।

যা আজ বিস্তৃত হয়ে কয়েক কোটিতে এসে দাড়িয়েছে। সেই ব্যবসা সোবহান চাচা একাই সামলাচ্ছে। বাবা আর চাচা ছোটবেলায় নাকি একসাথেই থাকতো,একসাথেই খেতো,একসাথেই ঘুরতো,লেখাপড়াও একসাথে করেছে। শুধু মতবিরোধ ঘটলো রাজনীতি নিয়ে।

বাবা কট্টোর আওয়ামীলীগ আর চাচা বর্তমানে বি এন পি এর মনোনীত চেয়ারম্যান। বাবা নেভীতে ঢুকে যায় আই এ পাশ করে,অপরদিকে চাচা ভার্সিটিতে চলে যায়। সেখানে শুরু করে তুমুল রাজনীতি। স্বয়ং এরশাদবিরোধি আন্দোলনে চাচা অংশগ্রহণ করে। মানুষ তর্কের ঝড় তুলে চায়ের কাপে,ড্রইং রুমে,আড্ডার জায়গায়। আমার বাবা আর আমার চাচা তুলে দৈনিক পত্রিকায়। যেমন কিছুদিন আগে ঢাকা শহরের যানজট নিয়ে বাবা বিশাল এক পত্র লিখে "দৈনিক ইত্তেফাকে।"

সেই পত্র ছাপানো হয়। বাবা অপেক্ষা করছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই আমার চাচা পত্রের এগেইন্সটে বর্তমান সরকারের সাফল্য নিয়ে সম্পাদকীয়তে লিখলেন। তা পড়ে বাবার প্রেশার হাই হয়ে যায়। বাবাকে দেখছি আজকাল মার্কিং করছে। কী মার্কিং করছে তা জানিনা। পেপার পড়া আমার কাছে অন্যতম বিরক্তের একটা জিনিস। তবে বাবাকে দেখে মনে হলো বাবা এবার সিরিয়াস কিছু নিয়ে মাঠে নামবে। সরকারকে সমালোচনা করে কচুকাটা করবে।

এই ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করতে হবে কোন দলের সমর্থক তিনি। যদি বি এন পির সমর্থক হয় তাহলে বাবার সামনে নিয়ে হাজির করে বলব "এই নেন আব্বা। আপনার ভাইয়ের ডুপ্লিকেটকে পেয়েছি আপনার ভাই মনে করে সব বের করে দেন।"

সকালে বাবার সাথে যা করেছি তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে এটা করা যায়। তার আগে উনাকে নিয়ে আজ উত্তরা যাওয়া যাক।

"উত্তরা যাবো।"

"উইঠা পড়েন।"

"ভাড়া কত?"

"যত হয় ততই দিয়েন"

"১০০ টাকা দিবো।"

আমার ভাড়ার কথা শুনে ড্রাইভারসাহেব তার সিএনজি স্টার্ট দিয়ে বলল "এই ভাড়াই কেউ যাইবে না। তারচেয়ে ভালো হয় বাস দিয়া চইলা যান।"

ডুপ্লিকেট চাচাকে হারানোর ইচ্ছে হলো না।

"কততে যাবেন?"

"আপনারে দেইখায় বুঝা যায় আপনি ছাত্র মানুষ। আপনার থাইকা বেশি ভাড়া নিমু না। আপনি আর ৫০ টাকা বাড়াইয়া দেন।"

"চলেন।"

উঠার আগে শেষবারের মত আকাশের দিকে তাকালাম। মেঘের কোন আনাগোনা নেই। ব্যাপার কি ? ইন্দ্রদেব কি বেশিই মত্ত অপ্সরীদের নাচে? কবিগুরুকে কি আটকে রাখলো নাকি স্বর্গে আজ ঈশ্বর? অপেক্ষা করে লাভ নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কবিগুরুকে উত্তরায় ডেলিভারি দিয়ে মুক্ত হয়।

সিএনজি ছেড়ে দিল। কি করে সময় পার করা যায়? বই পড়লে কেমন হয়? না আজ না হয় রবীন্দ্রনাথকে ছাড় দেওয়া যাক। আজ না হয় চেতনায় থাকুক রবীন্দ্রনাথ। তার থেকে ভালো থেকে ভালো ডুপ্লিকেট চাচার সাথে গল্প করা যাক। ডুপ্লিকেট সোবহান চাচা তার কাজ খুব ভালোমত করে যাচ্ছে।

"আপনার নাম কী মামা?"

মামা নিরুত্তর। মনে হয় খেয়াল করেনি। তাছাড়া সিএনজির এই আওয়াজের মধ্যে আমার এত আস্তে করে বলা না শুনার ই কথা।

"মামা আপনি কানে শুনতে পান?" এবার জোরেই বললাম। মনে হয় সিএনজির বাইরেও আওয়াজ গিয়েছে। অনেক পথচারী বোধ ভাবছে কোন ভাগ্নে তাকে কুশল জিজ্ঞেস করছে।

"মামা কিছু কইছেন" পিছন দিকে কয়েক সেকেন্ড এর জন্য ফিরে বলল ড্রাইভার। এবার হয়ত খেয়াল করবে আমার দিকে।

"আপনার নাম কি মামা?"

"খুরশিদ আলম?"

"দেশের বাড়ি কই মামা?"

"চট্টগ্রাম ,আগ্রাবাদ" "

বাহ! হাকিমের দেশের মানুষ। প্রায় ১ বছর আগে গিয়েছি সেখানে। যাওয়াটা ছিলো সম্পূর্ণ আন এক্সপেক্টেড। পূজোর ছুটি হয়েছিলো দশ দিনের জন্য। সারদা অবশ্য দুই দিন পরে যাবে দেশের বাড়িতে। আমিও প্ল্যান করছিলাম কুমিল্লাতে যাওয়ার।

ক্যান্টিনে বসে জুলফিকারের সাথে কথা বলছিলাম। জুলফিকার তার কবিতা শুনাচ্ছে ধরে! জুলফিকার নিজেকে দাবী করে লো ক্লাসের কবি হিসেবে। তার সব কবিতা নাকি প্রতিবাদী কবিতা।

বৈষম্য নিয়ে লেখা। পুঁজিবাদদের শোষণ এর বিরুদ্ধে লেখা। সেই জন্য নাকি কোন প্রকাশক ই রাজি হচ্ছে না তার বই বের করার। কবিতা ছাপা হোক আর না হোক সে কবি। এটুকুতে নাকি তার স্বস্তি আসে।

অবশ্য সেই প্রথম বর্ষ থেকে দেখছি সে সময় পেলে ডায়েরির মত খাতায় কবিতা লিখে আসছে। সময় পেলেই ক্লাসে জোরে জোরে সেই কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছে। প্রথম প্রথম সবাই জুলফিকারকে কবি হিসেবে সমীহ করত। কিন্তু সময় বাড়ার সাথে সাথে জুলফিকার এর দাম কমতে থাকল। জুলফিকার এখন অলটারনেটিভ হিসেবে ধরে ধরে কবিতা শুনায়।

বৃষ্টি হবে,আকাশে মেঘের ডাক। দিনও অন্ধকার। খারাপ আবহাওয়ার জন্য ফিল্ডে ক্লাস বাতিল। সবাই হুড়মুড়য়ে বের হচ্ছে। বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য কেউ আবার দৌড় শুরু করেছে হলের উদ্দেশ্যে আবার কেউ বাসের জন্য অপেক্ষা করছে। আমি গেট এর সামনে এসে রিকশায় উঠলাম। এমন সময় জুলফিকার এসেও উঠলো। জুলফিকার এস এম হলের।

"এই মামা ছাড়েন।"

রিকশা ড্রাইভার রিকশার প্যাডেলে চাপ দিলো। জুলফিকার ব্যাগ থেকে ডায়েরি বের করে চোখের সামনে ধরলো। আমি ভাবলাম মনে হয় রিকশায় চড়তে চড়তে কবিতা লিখবে। না আমাকে অবাক করে দিয়ে রিকশাওয়ালাকে বলল, "মামা কবিতা শুনবেন?"

রিকশাওয়ালা চোখ ছানাবড়া করে তাকালো। মনে হলো রিকশাওয়ালে লাইকা এর মত চাঁদে পাঠানোর কথা বলল জুলফিকার।

"কি যে কন ,কবিতা হুনাইবেন। ইচ্ছা হইছে যেহেতু হুনান" রিকশাওয়ালা তার লাল দাঁতগুলি বের করে বলল।

তার হলুদ দাঁতগুলি এই অন্ধকার দিনে ট্রাফিক জ্যামের হলুদ বাতির মত লাগলো। রিকশাওয়ালার কথা শুনে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল। জোরে জোরে কবিতা পাঠ করতে লাগল। রাস্তার দুপাশের মানুষ বিশেষ দৃষ্টি দিতে লাগলো। নিজেকেও বিশেষ মনে হলো কবির পাশে বসতে পারে।

"এই একটু এদিকে আয়" হাকিম বলল। হাকিম এসে রক্ষা করলো। নাহয় কতক্ষণ জুলফিকার আমাকে জোরপূর্বক কবিতা শুনাতো সেটা প্রায় অনিশ্চিত ছিল। আমি ক্যান্টিন থেকে উঠে হাকিমের সাথে রুমের উদ্দেশ্যে হাটা লাগালাম।

"এই চল আমার দেশের বাড়ি যাবি" হাকিম বলল।

"কবে?"

"আজ রাতের ট্রেনে।"

হাকিমের কথা শুনে একসাথে রোমাঞ্চ আর ভয় লাগল।

"রাতে গেলে কোন সমস্যা হবে না?"

হাকিম আমার কথা শুনে হেসে উঠলো। একদম বাংলা ছবির ভিলেনদের মত হাসি। তার হাসির শব্দ শুনে মনে হলো দুপাশের দেয়াল কেপে উঠলো।

"কিসের ভয় রে? আর তুই ভুলে গেলি নাকি যে আমার বাপ পুলিশের দারোগা।"

বাংলাদেশে যদি মেদহীন রোগা দারোগাদের লিস্ট করা হয় তাহলে হাকিমের বাবার নাম আগে উঠবে। সাধারণ পুলিশের কোন বৈশিষ্ট্য নেই উনার মধ্যে। এত বছর পুলিশে সার্ভিস দেওয়ার পর উনার মেদ বের হয়নি। পুলিশ জাদুঘরে রাখার মত জিনিস হাকিমের বাবা।

"টিকিট কাটছিস?"

"হা,দুইটা কেটে নিয়ে আসছি।"

"তুই জানলি কি করে আমি যাবো।"

হাকিম আমার কথা শুনে মুচকি হাসি দিলো। রহস্যে ভরা হাসি। যে হাসির মানে ধরা মুশকিল।

সেদিন রাতে কেন জানি মনে হলো সারদার সাথে দেখা করা দরকার। সেই বছর সারদা হলে উঠেনি। নীলক্ষেত সরকারি স্টাফ কোয়ার্টারে থাকত। রাত দশটার পর স্টাফ কোয়ার্টারে ঢুকা সম্পূর্ণ নিষেধ। কিন্তু ক্যান জানি মনে হলো সারদার সাথে দেখা না করে যেতে পারবো না।

কি আর করা। আমি আর হাকিম গিয়ে হাজির হলাম ওর বাসার নিচে। নিচে বসা দারোয়ানকে অনেক রিকুয়েস্ট করার পর সারদার কাছে খবর পাঠালাম। দারোয়ানের সাথে সারদা নিচে নেমে আসলো।

"কি রে কোথাও যাওয়া হচ্ছে নাকি?"

"চট্টগ্রাম যাচ্ছি। তোমার প্রেমিক তো তোমাকে না দেখে যেতেই চাচ্ছে না" হাকিম জবাব দিল। হাকিমের কথা শুনে অসস্তিতে পড়ে গেলাম।

"ও আমার প্রেমিক না। আমার প্রেমিক অন্যজন" সারদা জবাব দিলো। সারদার প্রেমিক হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। সো হাকিমের কাছে মিথ্যে প্রেমিক হয়েও লাভ নেই।

"কি যে বলিস।আমি ওর প্রেমিক না। এসব চিন্তা কোত্থেকে যে তোদের মাথায় আসে" নিজেকে ডিফেন্ড করার ট্রাই করলাম। মনে হয় লাভ হলো না।

"এক মিনিট দাঁড়া,আর হাকিম ভাই এক মিনিট দাঁড়ালে মনে হয় আপনার বেশি সমস্যা হওয়ার কথা না" বরাবর এর মত সারদা দেবী রূপে এসে রক্ষা করলো।

"না বইন " হাকিম মুচকি হেসে বলল।

সারদা উপরে চলে গেল। কয়েক মিনিট পর হাতে একটা পানির বোতল আর টিফিন বক্স নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির হলো। নিচে নেমে আমার হাতে এগুলা ধরিয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিলো কিছুক্ষণ।

"কি এসব?"

"রুটি আর সুজির হালুয়া। করেছিলাম অন্য কারও জন্য। সে আসেনি তুই নিয়ে যা" সারদা জবাব দিলো।

বুঝলাম তার প্রেমিকের জন্য বানিয়েছিল এখন আমাদের কাছে তা দিয়ে নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাচ্ছে। কি আর করা,আমরাও একজন সুবোধ ছেলের মত এসব নিয়ে রওনা দিলাম।

সেদিন রাতে ট্রেনে জার্নি করে সকালে উঠেছিলাম পুলিশ কোয়ার্টারে। তবে আংকেল-আন্টির সেবা যত্নে ওজন বেড়েছিলো পাঁচ কেজি এক সপ্তাহে। যেটা প্রায় মিরাক্কেল। হাকিমের আগের মতই ছিল আর আমার ওজন বেড়ে ভুঁড়ি আর গাল কয়েক ইঞ্চি বেড়ে গেল।

যাক, মামার সাথে তাহলে একটু আড্ডা দেওয়া যাবে। আড্ডাটা টেনে একটু বড় ও করা যাবে।

"মামা আগ্রাবাদ কই।"

"আগ্রাবাদ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায় মামা।"

বাহ! ভালই। পুলিশ কোয়ার্টার ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায়। সেখানে আবার জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর ও অবস্থিত।

"মামা জব্বার ডাকাতের চায়ের দোকানটা কি এখনো আছে?"

খুরশিদ আলম আমার কথা শুনে বেবি ট্যাক্সি একটু স্লো করলো। আমিও এবার একটু সিএনজির দরজা দিয়ে চারপাশ তাকালাম। কাকরাইল এসে পড়েছি।

"মামা আপনি কি চাটগাঁইয়া নাকি?" আমার দিকে পিছন ফিরেই বলল।

"না" মুখে মুচকি হাসি দিয়ে বললাম।

"তাইলে মামা এতকিছু জানেন ক্যামনে?"

"আমি ডিবির লোক। আগ্রাবাদে কিছুদিন ছিলাম।"

এবার আমার কথা শুনে ভড়কে গেলো। গতি স্লো করে ফেলল। সামনে মালিবাগে ডিবির অফিস। ঠিকসময়ে ঠিক যায়গায় বললাম তাহলে কথাটা। এবার দেখি আমার ডুপ্লিকেট চাচা কি করে।

"স্যার আমিতো কিছুই করি নাই। আমার লাইসেন্স আছে। আর আমি স্যার বিএনপি করি। আমার বাব-দাদারাও বিএনপি করতো। আমার রক্তে বিএনপি মিশে আসছে স্যার" এক নিঃশ্বাসে বলল। ভয়ে একদম জমে গেছে খুরশিদ আলম। তাকে আরেকটু ভয় দেখানো যাক।

" এসব বলে পার পাওয়া যাবে না। তোমার বিরুদ্ধে আমাদের কাছে প্রমাণ আছে। তোমার সিএনজিতে করে স্মাগলাররা গাজা স্মাগলিং করে" একটু কর্কশ গলায় বললাম।

খুরশিদ আলম আমার কথা শুনে সিএনজি রাস্তার পাশে এসে থামালো। সিএনজি থেকে নেমে পিছনে এসে দাঁড়ালো।

"স্যার আমি নির্দোষ। বিশ্বাস করেন এসব ভুয়া অভিযোগ।আল্লাহর কসম কেটে বলতাছি এসব আমি করি না" হাতজোড় করে বলতে বলতে কেঁদে দিলো খুরশিদ আলম। আমিও সিএনজি থেকে নামলাম। সিগারেট খেতে ইচ্ছে হচ্ছে করছে।

"তুমি নির্দোষ? কিন্তু আমাদের কাছে তো শক্ত প্রমাণ আছে তুমি দোষী।"

"বিশ্বাস করেন স্যার। সব আমার বিরুদ্ধে করা ষড়যন্ত্র। নিশ্চয় এইটা নিজামের কাজ।"

খুরশিদ আলমের চোখ দিয়ে এখনো পানি পড়ছে। খুরশিদ আলমের কাঁধে পড়ি আমি। তারমানে উনি পাঁচ ফিট এগারো এর উপরে। মুখে বিশাল গোঁফ। বিশাল বপু,মুখে একটা সুপুরুষ সুপুরুষ ভাব। বড়

অফিসার যদি হতো,তাহলে উনার অধীনস্থরা কখনো উনার অবাধ্য হতো না। আর্মিতে থাকলে হয়ত এমনি উসমানির মত জাঁদরেল জেনারেল হতো। কিংবা ডাকাত সর্দার যদি হতো তাহলে বিশাল সাকসেস নিয়ে ওয়ান্টেড লিস্টে সবার উপরে থাকতো। এমন একটা মানুষ সিএনজি ড্রাইভার।

আবার তার উপর বাচ্চাদের মত কাঁদছে যেটা একদম বেখাপ্পা মনে হচ্ছে। সৃষ্টি কর্তার কি অবিচার এটা যে যেরকম শরীর পাওয়ার কথা তার পার্সোনালিটি অনুযায়ী সেরকম পাচ্ছে না।

আমাদের ইকোনমিক্স টিচার। ক্লাসের প্রথমদিন প্রথম ক্লাসটা উনিই নেন। প্রথম ক্লাস সবাই এক্সাইটেড। সবাই ভেবেছিলো প্রথমদিন ক্লাস নিবে টাই-স্যুট পড়া,চোখে ইলাস্টিক ফ্রেম ওয়ালা চশমা পরিহিত কোন শিক্ষক। যার বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ সব ছাত্রছাত্রীদের মনের ভিতর দাগ কেটে ফেলবে। কিন্তু সবার আশা ভরসা ভেঙে দিয়ে ক্লাসে হাজির হলেন মাহফুজ স্যার।

গায়ে ঢিলেঢালা সুতির সাদা পাঞ্জাবি আর পায়জামা। পাঞ্জাবির ভিতর দিয়ে স্যান্ডু গেঞ্জি দেখা যাচ্ছে। পায়ে বার্মিজ জুতো। চোখে নীলক্ষেত থেকে কেনা সাধারণ ফ্রেমের চশমা। ডান হাতের বগলে একটা বই আর বাম হাতে এটেন্ডেন্স এর খাতা। ভার্সিটির টিচার থেকে উনাকে বেশি মনে হলো গ্রামের কোন প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার। যিনি গণিত পাঠ করান সবাইকে।

স্যার ঢুকতেই সবাই দাঁড়িয়ে গেল। স্যার বই আর খাতাটা টেবিলের উপর রাখল। সমস্ত ক্লাসে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। সবাই এখনো দাঁড়িয়ে। স্যার হাত দিয়ে ইশারা করল। তারপর সবাই বসে পড়ল।

"আমার ক্লাসে কোন ফর্মালিটি নেই। আমাকে ক্লাসে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাতে হবে না। ক্লাস ভালো লাগলে ক্লাসে থাকবে নয়ত সোজা বের হয়ে যাবে। কোন ফর্মালিটি নেই" স্যার চিবিয়ে কথা বলতে শুরু করলো। আবার স্যার সবার দিকে একবার চোখ বুলালো।

"এখন সবাই যার যার নাম আর দেশের বাড়ি বলবা। প্রথম ক্লাস যেহেতু সবাই ইন্ট্রো দাও। ডান পাশ থেকে শুরু" স্যার নির্দেশ দিলেন।

ডানপাশের সারিতে প্রথম বেঞ্চে ছিলো জিসান। জিসান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠিকমত ইন্ট্রো দিল। জিসানের পাশে বসা থাকা তানজিনা ধরা খেলো।

তানজিনা দাঁড়ালো এবং ইন্ট্রো দিতে শুরু করলো "আমার নাম তানজিনা আক্তার । আমার দেশের বাড় নরসিংদী। আমার বাবা....

"এই মেয়ে তোমাকে তোমার নাম আর দেশের বাড়ি কই সেটা বলতে চাইছি। তুমি কি তোমার বাবার কাছে গিয়ে বলবা সবাইকে তোমার দেশের বাড়িতে নিয়ে দাওয়াত খাওয়াবা সবাইকে?" তানজিনার কথা শেষ না হতেই স্যার বলে উঠলো। স্যারের কথা শুনে পুরা ক্লাস চুপসে গেল। তানজিনা মাথা নুইয়ে ফেলল।

"বের হও আমার ক্লাস থেকে। এখুনি বের হও।"

স্যারের কথা শুনে তানজিনা সেদিন কাঁদতে কাঁদতে বের হয়ে গেল। তারপর থেকেই সবাই এই স্যারের ক্লাসে রোবট হয়ে গেল। অবশ্য স্যার পরে তানজিনাকে নিজের রুমে ডাকিয়ে নিয়েছিল। এখন তানজিনা হাইয়েস্ট সিজিপিএ নিয়ে ক্লাসের প্রথম আর স্যারের ও প্রিয় স্টুডেন্ট। স্যারকে তার শর্ট টেম্পার এর জন্য আমরা ছোট মরিচ ডাকি। অবশ্য স্যার মনের দিক থেকে অনেক ভালো। কাওকে ফেইল করাই না স্যার।

আমার সামনে বসা খুরশিদ আলমকে দেখে মনে হচ্ছে উনার শরীরটা স্যারের পাওয়ার দরকার ছিল। আর উনি স্যারের টা। সিএনজি ড্রাইভার খুরশিদ আলম এখন বেবীর মত কাঁদছে।

"সেসব জানিনা। এখন তোমাকে এরেস্ট করা হবে। আমার লোক পিছনেই ফলো করছে আমাকে। তোমার গাড়ি জব্দ করা হবে। রিমান্ডে নিয়ে গরম ডিম ঢুকালেই সব এমনি এমনি বের হয়ে যাবে।"

খুরশিদ আলম সাহেব এবার আমার পায়ে এসে ধরল।

"স্যার আমি নির্দোষ। বিশ্বাস করেন স্যার আমি এসবের সাথে জড়িত না। সব ষড়যন্ত্র" আবার কেদে দিলেন তিনি।

মানুষটা কিছুক্ষণ পায়ে ধরে থাকুক। জীবনে প্রথমবার কেউ আমার পায়ে ধরছে। ভালই লাগছে। এতটাই দূর্ভাগা আমি। ঈদের সালামী নিতে বাবা আর ভাইয়ার পায়ে আমাকে ধরতে হয়েছে অথচ এখন পর্যন্ত সালামির উদ্দেশ্যে কেউ আমার পায়ে ধরেনি। আশেপাশে লোকজন জড়ো হচ্ছে। থাক আর মানুষটাকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই।

"উঠো,উঠো। আমার জন্য এক প্যাকেট ক্যাপিস্টান নিয়ে আসো।"

খুরশিদ আলম আমার পা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

"স্যার আমাকে এরেস্ট করবেন না তো? এই গাড়িটায় আমার সম্বল। এইটা দিয়া রুজি করে নিজের সংসার চালাই। আমার পেটে লাথি দিয়েন না স্যার।"

"গাড়ির চাবিটা দিয়া যাও আর এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আসো" খুব সিরিয়াস হয়ে বললাম।

কতটা সিরিয়াসনেস ফুটাতে পারলাম নিজের কথার মাধ্যমে তা নিয়ে সংশয় আছে। সকালে রিকশাওয়ালার কাছে ধরা খেয়ে আসলাম।খুরশিদ আলম চলাকি ধরতে পারে পিঠের ছাল আস্ত রাখবে না।

না খুরশিদ আলম চালাকি ধরতে পারেনি সুবোধ বালকের মত সিগারেট আনতে গেল।

পাঁচ

স্টার টানতে টানতে প্রায় বিরক্ত। মাঝেমধ্যে টাকা পেলে বেনসন আর হ্যাজেস টানা হয়। তা নাহলে এভারেজ স্টুডেন্টসদের মত স্টার দিয়ে চালিয়ে দেয়। অবশ্য আমার স্মোকিং নিয়ে এখনো আমার ফ্যামিলির কাছে কোন অভিযোগ যায় নি। সারদার কাছেও লুকিয়ে রেখেছি অনেকদিন। কিন্তু একদিন ধরা খেয়ে গেলাম।

এফ আর হলের সামনে থেকে সিগারেট ধরিয়ে নিলক্ষেতে যাচ্ছিলাম। রাস্তা ক্রস করে ওপারে উঠলাম মাত্র দেখি সারদা আমার সামনে। সিগারেট আমার ঠোটে। ওকে দেখা মাত্র জমে গেলাম। সিগারেট ঠোটে ঝুলানো। ধোয়াগুলু বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। টান দিতে পারলাম না। সারদার দুই চোখ একবার আমার সিগারেট আরেকবার আমার চোখের দিকে যাচ্ছে। দু হাত কোমরে দিয়ে এরকম করে যাচ্ছে।

"কবে থেকে খাস?" সারদার কথায় হুশ ফিরলো। সিগারেট ঠোট থেকে হাতে নিয়ে ফেলে দিলাম রাস্তায়।

"থাক আর নাটক করতে হবে না। আমার সিগারেটে কোন প্রবলেম নাই। আমার বয়ফ্রেন্ড ও সিগারেট খায়। তাতে আমার কোন সমস্যা হয় না।"

সারদা যখন তার বয়ফ্রেন্ডের কথা বলে মনে হয় কেউ যেন বুকের ভেতরটা চিরে দিচ্ছে।

" ক্লাস এইট থেকে খাচ্ছি" নিজেকে সামলিয়ে বললাম।

"দুগগা দুগগা! ক্লাস এইটে ছেঁকা খায়ছিস নাকি?"

আজকাল মেয়েরা ভাবে সিগারেট খেলেই ছেলেটা ছেঁকা খেয়েছে। তারসাথে যদি ছেলেটা নিয়মিত পাঞ্জাবি পড়ে আর লম্বা দাড়ি রাখে তাহলে তো কথায় নেই। ভাবনা বাস্তবে রূপ নেয়। সেই জন্য এরকম ছেলেদের দিকে কোন মেয়েই টান ফিল করে না। ভাবে ছেলেটা লুজার।

"ছেঁকা খেলেই কি সিগারেট খায়। তা নাহলে কি খায় না কেউ। "

"তা জানিনা ভাই। তুই এসব ছাই পাশ কেন খাস?"

সেদিন সারদার কথায় কোন জবাব দিলাম না। আসলে আমি কেনও সিগারেট খাই? সেটা নিয়ে ভাবছি। অবশ্য সিগারেট খাওয়ার মধ্যে শান্তি আছে। সেই শান্তি একেক স্মোকারদের কাছে একেক রকম। যেমন আমার বাবার মত ছুচে বুদ্ধিজীবি যারা তাদের কাছে সিগারেট হলো দেশ নিয়ে ভাবার একটি স্টিমুলাস। যখন সিগারেট নিয়ে রকিং চেয়ারে হেলান দিয়ে টান দেওয়া হয়,হালকা ঘুমের ভাব আসে। তখন অনেক জটিল রাজনীতির প্যাঁচ খুলে যায়। সেই প্যাঁচ খুলেই দেশের রাজনীতিতে নতুন নতুন ইস্যু যোগ করা হয়। তারপর যারা কিউরিসিটি বশত বন্ধুর কাছ থেকে নিয়ে সিগারেট নিয়ে টান দিয়েছে তো দিয়েছে আজ বন্ধুকে ভুলে সিগারেটটাকেই ধরে রেখেছে। তারপর আরেক শ্রেণি যারা ছেঁকা খেয়েছে। প্রিয়তমাকে ভুলার জন্য সিগারেট নিয়েছে। অথচ প্রিয়তমাকে ভুলতে পারেনি ঠিক ই সিগারেতটাকে নতুন প্রিয়তম বানিয়ে ফেলেছে।

হঠাত করে ব্রেক ধরলো খুরশিদ আলম। মাথায় আঘাত পেতে পেতে বাঁচলাম। "কি হইছে?হঠাত ব্রেক মারলা ক্যান" ধমক দিয়েই বললাম।

"স্যার এক্সিডেন্ট করছে।"

সিএনজি থেকে নেমে দেখি মৌচাক মার্কেট এর সামনে কিছু মানুষ জড়ো হচ্ছে। আস্তে আস্তে ভীড় বাড়ছে। দৌড়ে গেলাম। ভীড় ঠেলে ভিতরে গিয়ে দেখি স্কুটি উলটানো। স্কুটির পাশ থেকে এক পুরুষকে টেনে বের করছে কয়েকজন লোক। লোকটির মাথা দিয়ে ফোয়ারার মত রক্ত পড়ছে।

"আমার হাজব্যান্ডকে প্লিজ আপনারা বাঁচান। উনাকে হসপিটালে নিয়ে যান" পাশেই দেখলাম এক মহিলা বসে আসে। মহিলার হাত ছিলে গেছে। মাথায় হেলমেট মহিলার। পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি ডান পা ভেঙে আছে। আমি এগিয়ে গিয়ে পুরুষটিকে কোলে নিলাম। পুরুষটির মাথা কে যেন গামছা দিয়ে বাধলো। তবুও চুইয়ে চুইয়ে পড়া রক্তে আমার নীল পাঞ্জাবি লাল হচ্ছে। শান্তিনগরে নিয়ে গেলাম হসপিটালে। পুরুষটিকে ইমার্জেন্সি রুমে ঢুকানো হলো। সাথে মহিলাকেও। আমি রক্ত পরিস্কার করার উদ্দেশ্যে ওয়াশরুমে গেলাম। রক্তে আমার পাঞ্জাবির বুক থেকে নাভী পর্যন্ত ভিজে গেছে। পাঞ্জাবিটা খুলে ধোয়া শুরু করলাম। রক্ত মেশানো পানি আস্তে আস্তে নলের মধ্যে হারিয়ে যেতে লাগলো। অনেকটায় পাঞ্জাবি পরিষ্কার হয়েছে। পড়ে নিলাম। রক্তের দাগ সম্পূর্ণভবে যায় নি। মুখে পানি দিলাম। পানি দেওয়ার স্বস্তি ফিল করলাম। মনে পড়লো খুরশিদ আলম আর রবীন্দ্রনাথের কথা। খুরশিদ আলমকে যা ভয় দেখিয়েকে নিয়েছি আমার মনে হয় সে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ভেগেছে। রবীন্দ্রনাথ হয়ত বলছে "এ মোরে করিতেছে হরণ।"

দৌড়ে বের হলাম। ইমার্জেন্সি রুমের সামনে গিয়ে দেখি কয়েকজন মানুষ দাঁড়িয়ে আহে। তার মধ্যে একজন খুরশিদ আলম যাক রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেনি খুরশিদ আলম। কাছে যেতেই একজন বলল "ভাই আপনার রক্তের গ্রুপ কি ও পজেটিভ?"

"হা"

লোকটি আমার কথা শুনে ইমারজেন্সি রুমের দরজায় নক করল কয়েকবার। একজন নার্স বেরিয়ে আসলো। নার্স আসা মাত্রই লোকটি হাত দিয়ে আমাকে দেখালো।

"উনার গ্রুপ ও পজেটিভ।"

নার্স আমার উপর-নিচ একবার ভালো করে দেখলো।

"আপনার গ্রুপ ও পজেটিভ ? রক্ত দিতে কোন সমস্যা নেই তো। পেশেন্টের অনেক রক্ত ক্ষরণ হয়েছে। ইমিডিয়েট রক্ত না দিতে পারলে পেশেন্ট মারা যাবে।"

"এই তুমি ১০ মিনিট দাড়াও আমি রক্ত দিয়ে আসি।" খুরশিদ আলমকে বললাম।

"জ্বি স্যার।"

পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে দিলাম খুরশিদ আলমকে।

"এটা টানতে থাকো হসপিটালের বাইরে বসে, আমি আসছি।"

ইমার্জেন্সি রুমে শোয়ানো হলো আমাকে। ভাবলাম ফর্ম দিবে পুরণ করার জন্য। না কিছুই দিলো না। নার্স এসে সোজা সুই লাগালো রক্ত নেওয়ার জন্য।

রক্ত দিচ্ছি প্রায় ৪ বছর ধরে। রক্ত দেওয়া শুরু করি ফাস্ট ইয়ার থেকেই। একবার ত কারও দুঃখে এতটায় দুঃখী হলাম যে তিন মাস না হতেই রক্ত দিয়ে দিলাম।

ঘটনাটা এমন ছিলো ক্লাস শেষ করে ঢাকা ঢাকা মেডিকেলের সামনে বসা দোকানগুলুতে আসলাম চা খাওয়ার জন্য। চা শেষ সিগারেট ধরিয়ে আবার ডিপার্টমেন্টে যাচ্ছি। এমন সময় দেখলাম সামনে থেকে জিনিয়া আপু এগিয়ে আসছে। জিনিয়া আপু আমার এলাকার। আইন বিভাগে পড়ছে। আমার ইমিডিয়েট সিনিয়র।

"এই তোর রক্তের গ্রুপ কি" ?

জিনিয়া আপু আমাকে দেখেই বলল। আপুকে অনেক চিন্তিত মনে হলো।

"ও পজেটিভ।"

"আল্লাহ বাচাইছে। চল আমার সাথে।"

"কই?"

"এক মহিলা ইমার্জেন্সি অবস্থায় আছে ঢামেকে। আমাদের কুমিল্লার। বাচ্চা হবে। রক্ত সল্পতার জন্য সার্জারি করা যাচ্ছে না। আর ইমার্জেন্সি সার্জারি না করতে পারলে বাচ্চা আর মা কাওকে বাঁচানো যাবে না।"

আপুর কথা শুনে এতটায় আবেগি হলাম যে কিছুদিন আগের রক্তাদানের কথা ভুলে গেলাম। ছুটে গেলাম ঢামেকে। দিলাম এক ব্যাগ রক্ত। প্রথমত কিছুই ফিল করলাম না। দু' দিন পর মাথা ঘুরিয়ে ক্লাসে পড়লাম। ভর্তী করানো হলো আমাদের ভার্সিটির মেডিকেলে। যেখানে সবকিছুর সমাধান প্যারাসিটামল। কয়েকটা টেস্ট করে দেখলো শরীরে রক্তের অভাব। বন্ধুরা মিলে রক্ত খুঁজছে। কয়েকদিন হয়ে গেল। আমি হসপিটালের বেডে পড়ে আছি। এর মধ্যে সারদা একদিন ও দেখতে আসলো না। কেন যে খুব খারাপ লাগলো সেটা বুঝতে পারলাম না।

একদিন বিকেলে সারদা আসলো। দেখে বিছানা থেকে উঠে বসলাম। ও এসে সোজা আমার বেডে বসল আমার পায়ের কাছে। মাথা নিচু করে চোখের পানি ছেড়ে দিলো। কি অপূর্ব দৃশ্য ছিলো সেটা। ওর চোখের পানি ওর শুভ্র গাল বেয়ে নিচে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। বিছানা ভিজতে লাগলো। ওর চোখের পানি আমার জন্য জড়াচ্ছে। তার থেকে সুখের ওই মুহূর্তে কিছুই ছিলো না। হাত দিয়ে কয়েক ফোটা চোখের পানির ফোটা নিয়ে নিলাম। নষ্ট হতে দিলাম না। ও আমার দিকে ভেজা চোখে তাকালো। কি পবিত্র চাহনি ছিলো। সেদিন ওর চোখে দেখেছিলাম আমার জন্য ভালবাসা।

সারদা উঠে কিছু না বলে চলে গেল। আমি হাতে জমানো চোখের পানিগুলু নিয়ে বুকের বা পাশটা ভেজালাম। মনে হলো কে যেনও একদম শীতল করে দিয়েছে আমার মনটাকে। হাজারো কষ্ট ,বেদনাকে সারদার এই দু ফোটা জল নষ্ট করে দিয়েছে।

সারদা যাওয়ার কিছুক্ষণ পর হাকিম আসে। তার মুখে সেই রহস্যময়ী হাসি।

"আচ্ছা তুই কি এখনো বলবি সারদা তোর কেউ না?"

হাকিম এসে আমার পাশে বসলো। আমি জানি সারদা আমার সব। আমার সমস্ত দুনিয়ার অংশ সারদা।

"মানে কি?"

"বোকা বানাচ্ছিস কেন আমাকে? মেয়েটা আজ সকাল সকাল এসে আমাকে খবর দিলো। গিয়ে দেখলাম গেস্ট রুমে বসে আছে। আমাকে দেখেই উত্তেজিত হয়ে তোর খবর জানতে চাইলো। সব খুলে বললাম। তোর জন্য ও এইমাত্র রক্ত দিয়ে আসলো।"

হাকিমের কথা শুনে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম।

"সারদাকে দেখলাম কাঁদতে কাঁদতে বের হলো। কিছু বলেছিস নাকি?"

হাকিমকে উত্তর দেওয়ার মত সেদিন আমার কাছে কিছুই ছিল না। সারদাকে আমাকে একটু কাছে টানলে তার থেকে বেশি দূরে সরিয়ে দেয়। আমাদের কথার মাঝখানে সবসময় ওর বয়ফ্রেন্ডের কথা টেনে নিয়ে আসে।

"খুব কম মানুষের জন্য মেয়েরা সত্যিকারের চোখের পানি ঝরায়। আর তুই সেই ভাগ্যবান পুরুষদের একজন।"

আসলে আমি কি ভাগ্যবান? না দূর্ভাগা ?যে এমন একটি সম্পর্কে জড়িয়ে আছে যেটা দিনের পর দিন আমাকে মায়াজালের মত গ্রাস করছে।

"অন্য কোন কারণে কাঁদতে পারে। সারদা আমার প্রেমিকা হলে তুই অনেক আগেই জানতি। আজাইরা এইসব পাকিয়ে লাভ নাই"

" তুই আসলেই গাদা। কবে যে বুঝবি সেটা খোদা জানে" হাকিম ঝাড়ি দিয়ে চলে গেল। বুঝতেই পারিনি সেদিন হাকিম কেন এমন রাগ

দেখালো। সেদিন যদি বুঝতাম হয়ত ঘটনাটা এত দূর পর্যন্ত গড়াত না। আজ ২২ শে শ্রাবণ, হয়ত সারদা আমার পাশে থাকতো। দুজনে একসাথে সারাদিন ঘুরে বেড়াতাম সারদার কোলে মাথা রেখে গান শুনতে পারতাম। ওর নাকটা ধরে টান দিয়ে ওকে একটু জ্বালাতে পারতাম।

ছয়

বেলা প্রায় ১২ টা। এর মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে। আমি আছি রামপুরায় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে জ্যামে। যাক আজ দিনে সারাদিন রবীন্দ্রনাথকে পাশে নিয়ে ঘুরছি সেটাই বা কম কিসের। আজ রবীন্দ্রনাথ থাকলে ঢাকাকে নিয়ে নতুন কবিতা লিখে ফেলত। অবশ্য ঢাকাকে নিয়ে না লিখলেও ঢাকার জ্যামকে নিয়ে অবশ্যই কবিতা লিখে ফেলতেন।

সারাদিন বৃষ্টির দেখা নেই। ভ্যাপসা গরম। ২২শে শ্রাবণ বৃষ্টি হবে না এটা কি মেনে নেওয়া যায়?! পকেট থেকে বের করে সিগারেট বের করে

সিগারেট টানি সেটাই ভালো। খুরশিদ আলম সামনে বসে আছে। এখনো ভয়ের ভাবটা তার থেকে যায়নি। এখন সত্যিটা বের করলে খুরশিদ আলম আমাকে মেরে তক্তা বানানোর অনেক সম্ভাবনা অনেক। তার থেকে ভালো সে ভয় পেয়ে আছে ,ভয় পেয়ে থাকুক।

পেট ক্ষুধায় চো চো করছে। কিছু খাওয়া দরকার।

"জ্যাম ছাড়তে কতক্ষণ?"

"জানিনা স্যার।"

"এত বছর ধরে গাড় চালাও এখন জানোনা কতক্ষণ লাগবে" ধমক দিয়ে বললাম।

খুরশিদ আলমকে ধমকিয়েও মজা পাচ্ছি। এই জন্যই হয়ত সবলরা দূর্বলদের প্রতি অত্যাচার করে মজা পায়। পৈশাচিক আনন্দ এটা। জুনিয়রদের র‍্যাগ দিয়েও এই মজাটা পাওয়া যায় না।

"স্যার আপনি বসেন। আমি দেইখা আসি ব্যাপারটা কি?"

খুরশিদ আলম সিএনজি থেকে নেমে সামনে গেলো। আমিও বের হলাম। বিশাল জ্যাম লেগে আছে। আমি পাশেই তাকিয়ে দেখলাম জোনাকি সিনেমা হল। সিনেমা হলে জিবনে সিনেমা দেখেছি মাত্র একবার। আসলে সিনেমার প্রতি আমার ইন্টারেস্ট কম।

এই পর্যন্ত "টাইটানিক" মুভিই দেখা হলো না। সেটার জন্য অনেক হাসির পাত্র হতে হয়েছে আমাকে।

জীবনের প্রথম সিনেমা দেখি "বলাকা" সিনেমা হলে। সারদার সাথে। মুভিটি ছিলো হলিউডের এক হরর মুভি ভৌতিক একটি ছবি। ভয়ের বদলে আমার হাসিই পেয়েছিলো সমস্ত মুভি দেখে।

ক্লাস শেষ,বৃহস্পতিবার ছিলো। বৃহস্পতিবার আমি বাসায় চলে যাই। হলে থাকি না। বাসের জন্য ভিসি চত্বরে অপেক্ষা করছিলাম। হাতে রবীন্দ্রনাথের গোরা। খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলাম। এমন সময় দেখি সারদা মল চত্বর দিয়ে হেটে আসছে। সারদার মুখ অন্ধকার। মনে হল বিরাট বিপদ সারদার উপর । তার সুখের আকাশে মনে হলো মেঘের

ঘনঘটা। অপেক্ষা করছিলাম বর্ষনের জন্য। আমি গোরাতে মগ্ন হলাম। সারদার থেকে বাঁচার জন্য মুখ বরাবর বই ধরে পড়তে লাগলাম।

"তুই কি ভাবছিস তোকে আমি দেখতে পারবো না এভাবে থাকলে।ছাগল কোথাকার!"

চেয়ে দেখি সারদার মুখ আমার মাথার উপর উকি দিয়ে আছে। চোখ দেখে মনে হলো চোখে গাঢ় কাজল দেওয়া। সারদার কাজল দেওয়ার সিস্টেমটা অন্য মেয়েদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সাধারন মেয়েরা চোখে মোটা করে কাজল দিতে ভালবাসে। কিন্তু সারদা চিকন করে গাঢ় করে কাজল দেয়। দূর থেকে বোঝা যায় না কাজল দেওয়া আছে কি না। কাছে আসলেই বোঝা যায় সবকিছু।

আমি সারদার চোখের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। মেয়েটার চোখের দিকে তাকিয়ে মাঝেমধ্যে হারিয়ে যায়। সেদিন ও হারিয়ে গিয়েছিলাম।

শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি। রিকশায় উঠলাম। পাশে সারদা বসা। সারদা লাল শাড়ি পড়ে আছে। দুই হাত চুড়িভর্তী।

ভাড়ি চুরি না,লালা-নীল কাচের চুরি। মাথায় টেনে ঘোমটা দেওয়া। চোখে কাজল, সিঁথিতে মোটা করে দেওয়া সিদুরটা যেন মানুষকে বলে দিচ্ছে আমি কারও বাম পাশের হাড়। আমি চুপিসারে রিকশার একপাশে বসা।

দুপাশের কত অপরিচিত মানুষ আমাদের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে। কেউ আবার আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসি দিচ্ছে। আমি ভাবছি এই মূহুর্তে আমার পাশে বসে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে রূপবতী মেয়েটা। এবং সেই রূপবতী মেয়েটা আমার বিয়ে করা বউ। ভাবা যায় যেই ছেলের দিকে কোন সাধারন মেয়েই তাকাইনি আজ তার পাশে পৃথিবির সবচেয়ে রূপবতি মেয়েটা তার বউ হয়ে বসে আছে। আমার ইচ্ছে হলো ওর হাতটা ধরতে। কিন্তু ভয় ও হচ্ছে। অবশেষে অনেক সংকোচের পর আমি সারদার বাম হাত আমি আমার ডান হাত দিয়ে ধরলাম। সারদা আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দিলো। নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলাম। কিন্তু একটু পর সারদা তার হাতটি ছাড়িয়ে নিলো। জানিনা ভাবনার মধ্যে কোন আনন্দ অথবা সুখের অনুভূতি পায় না কেন কিন্তু দুঃখের অনুভূতি ঠিক ই বুঝতে পারে। আমিও বুঝতে পারলাম সেই অনুভুতিটা। তীব্র ভাবে আঘাত করলো আমাকে।

আমি মুখ কালো করে রিকশায় বসে থাকলাম। সারদাকে আমার সেই দিগন্ত মনে হলো যেটাকে দেখে আমি সারাজীবন ছুটবো কিন্তু কখনো ওই দিগন্তকে ধরতে পারবো না। সারদা তার কনুই দিয়ে আলতো করে খোচা দিল আমাকে। আমি একটু ব্যথা পেয়ে হাতটা সরালাম। সারদার দিকে তাকিয়ে দেখি ওর চোকে দুষ্টুমি খেলা করছে। ও নিজের বাম হাত দিয়ে আমার ডান হাতটাকে জড়িয়ে ধরে ওর মাথাটা এনে আমার বাহুতে রাখলো। জানিনা

স্বর্গে কেমন আনন্দ স্বর্গবাসীদের দেয়। কিন্তু আমার মনে হলো স্বর্গে আমাকে তার থেকে বেশি আনন্দ ইশ্বর আমাকে দিতে পারবে না।

"এই কি ভাবছিস?"

ভাবনার জগত থেকে ফিরে এলাম সারদার কথা শুনে। দিবাস্বপ্নটা কয়েক সেকেন্ডের জন্য ছিলো। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এত কিছু ঘটিয়ে ফেললাম। আসলে দিবাস্বপ্ন দেখার স্পেশাল ট্যালেন্ট আছে আমার। আমি কয়েক সেকেন্ডেই কয়েক বছর পার করে দিতে দিবাস্বপ্নে। মাঝেমধ্যে ইচ্ছে হয় কল্পনায় আছে। মানুষ তার ইচ্ছেমত কল্পনা করতে পারে। তার কল্পনার রাজ্যে সে খুব সুখী হয়।

"না কিছু না।"

"এই মুভি দেখতে যাবি ? চল যাই, আমার কাছে দুটো টিকিট আছে।"

"তুই কি আগে থেকে জানতি আমি তোর সাথে মুভি দেখতে যাবো যে টিকিট কেটে রাখলি?"

"ওর জন্য কাটছিলাম। ভাবছিলাম একসাথে দেখবো। কিন্তু ও আজ যেতে পারবে না। ঝগড়া করে আসছি এখন তোর সাথে ঝগড়া করতে পারবো না। প্লিজ চল যাই।"

সারদার বয়ফ্রেন্ডকে এখনো দেখা হয় নি। হয়ত আমিই দেখতে চাই না। গত দুই বছর ধরে সারদার মুখে সারদার প্রেমিকের কথা শুনে আসছি কিন্তু এখনো একবার দেখতে পারলাম না। সারদার প্রেমিকের উচ্ছিষ্ট ভোগকারী আমি। গত দুই বছর ধরে তাই করে আসছি।

মেঘের আনাগোনা আকাশে শুরু হলো। তারমানে ইন্দ্রদেব সূর্যদেবের সাথে ফাইনালি সব মিটমাট করে রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবিতে আসার অনুমতি দিলেন। ২২ শে শ্রাবণ বৃষ্টিতে ভেজার দরকার। বৃষ্টি হলে ভিজবো। ভাল করেই ভিজবো।

যাতে প্রচন্ড জ্বর হয়। জ্বর হলে ভালো ঘুম হয় কম কিন্তু ভালো স্বপ্ন দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথকে বিদায় করে কয়েকদিন স্বপ্নের রাজ্যেই থাকি। সেটাই ভালো। খুরশিদ আলম এগিয়ে আসছে। মুখে মহা বিরক্তি।

মনে হচ্ছে খুরশিদ আলম খুব কষ্ট করে কোন পকেটমার কিংবা চোর ধরেছে আর সে একটা থাপ্পড় দেওয়ার আগে সবাই তার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো চোর-পকেটমারকে। সবাই অন্তত একটা করে মার দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে সে ছাড়া।

"স্যার মন্ত্রী যাইতাছে। টিভি সেন্টার থেকেই জ্যাম। আরও এক ঘন্টা লাগবে রাস্তা ক্লিয়ার হইতে।"

আমাদের দেশের অন্যতম রাজনৈতিক ঐতিহ্য হলো কোন মন্ত্রী অথবা প্রতিমন্ত্রি গেলে তার ৩ ঘণ্টা আগে থেকেই সমস্ত রাস্তা অফ। অবশ্য আরেকটা ঐতিহ্য হলো নির্বাচনের আগে হজ্বে যাওয়া। আর সিলেটে মাজার জিয়ারত করা। গত কয়েকদিন আগেই ক্ষমতাসীন দলের কয়েকজন গেল হজ্ব করতে ,প্রধানমন্ত্রী সহ। হয়ত কিছুদিনের মধ্যে বিরোধী দলীয় নেত্রীও যাবে। যাওয়ার আগে বিরাট সাঙ্গবাদিক সম্মেলন করবে। সরকার দলীয় নেত্রীও ফিরে এসে সাংবাদিক সম্মেলন করবে। দেশবাসিকে জানান দিবে তাদের হজ্বে যাওয়ার কথা।

"চলো খেয়ে আসি।"

এখন পর্যন্ত আমি খুরশিদ আলমকে চমকাতে দেখিনি। এখন খুরশিদ আলম চমকে আছে। চোখ ছল ছল করছে। খুরশিদ আলমকে বোধ এখন পর্যন্ত তার কোন যাত্রী খাওয়ার ইনভাইটেশন দেয় নি। আমিই প্রথম ব্যক্তি বোধহয়। একটা মানুষকে কোন কিছু দিয়েই সন্তুষ্ট করা যায় না। কাওকে ১ কোটি টাকা দিলেও সে চাইবে আর ও এক কোটি টাকা। কেউ প্রধানমন্ত্রী কোন দেশের সে ও চাই আঞ্চলিক সংস্থার প্রেসিডেন্ট হতে। টাকা,ক্ষমতা আর যায় হওক মানুষ এইগুলাতে কখনো সন্তুষ্ট হয় না।

অথচ একটা মানুষকে পেট ভড়ে খাওয়ালে মানুষটা আর দ্বিতীয়বার খাবে না। সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

"স্যার গাড়ির যদি কিছু হয়?"

"আরে আমি আছি না। আসো খেয়ে আসি।"

সামনেই আবুল হোটেল। ঐটিহ্যবাহী এই অঞ্চলের মধ্য আর নিম্নবিত্তদের জন্য রেডিসন। সেখানেই খাওয়া যাক এখন। রবীন্দ্রনাথ ট্র্যাফিক জ্যামে আটকে আছে। থাকুক আটকে। মডার্ন ঢাকাবাসি হওয়ার প্রথম শর্ত হলো ট্র্যাফিক জ্যামে ঘন্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকার ধৈর্য। রবীন্দ্রনাথ কাগজে জমা থেকে সেই ধৈর্য অর্জন করুক আর আমি পেট পূজা করে আসি।

সাত

দীর্ঘ দেড় ঘন্টার পর সম্মানিত মন্ত্রী সাহেবের গাড়িবহর পার হলো। সূর্যদেব ও মেঘের আড়ালে চলে গেল। আবুল হোটেলে রুই মাছ আর বেগুন ভর্তা দিয়ে খাওয়ার পর একটা ঘুম দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। হলে থাকলে অবশ্য আয়েশ করে একটা ঘুম দেওয়া যেত। বাসায় থাকলে সেটা আর হয়ে উঠেনা। ইদানীং বাবার দাবা খেলার প্রতি ঝোক পড়েছে। কোন এক পেপারে দাবা খেলা নিয়ে আর্টিকেল দেখেছে সেটা পড়ার পর উনার মাথাইয় দাবা ঢুকে গেছে।

একদিন বাসায় ফিরলাম। সবাই আমাকে দেখে রীতিমত অবাক হলো। দরজা খুলল ভাইয়া।

"মা মেহমান আসছে"

ভাইয়ার কথা শুনে আম্মা ছুটে আসলো। এসে দেখে আমি। ভাইয়াকে গেল শাসন করতে।

"রসিকতা করছিস আমার সাথে। ফাজিল কোথাকার।"

"রসিকতা কই করলাম। তোমার ছেলে কি এই বাসার মানুষ নাকি! এক মাস হয়ে গেছে বাসায় ফিরে না।"

ভাইয়ার কথা শুনে খেয়াল হলো আসলে গত এক মাস ধরে তো বাসায় ফিরি না। নিজের বাসাকেই ভুলতে বসেছি আমি। আম্মা কিছু বলল না। চলে গেলো। আমার সাথেও কথা বলল না। আম্মা রাগ করেছে। রাগ করার ই কথা। দুনিয়ার কোন মা আমার মত জালিম সন্তান ডিজার্ভ করে না।

একদিন সকালে বাবা আবার দরজায় দাঁড়িয়ে কিল মারা শুরু করলো। ভাবলাম হয়ত আবার মর্নিং ওয়াকের জ্ন্য দরজায় কিল মারছে।

খুললাম না। কিল মারা বন্ধ হলো। ভাবলাম বাবা চলে গেছে। একটু পর আবার শুরু হলো। এবার কিল না। টোকার শব্দ আসছে। তারমানে ভাইয়া নক করছে। দরজা খুলে দেখি ভাইয়া দাঁড়িয়ে আছে।

"আম্মা স্ট্রোক করছে"

এরকম কথা শুনার পর যে কোন সন্তানের মাথা ঘুরে যাওয়ার কথা। চোখের সামনে অন্ধকার দেখার কথা।

"দাড়াই আছো কেন? তাড়াতাড়ি যাও আমি আসছি"

ভাইয়া আমার জন্য না অপেক্ষা করেনি আম্মাকে নিয়ে চলে যায়।

আমি ফিরে এসে ঘুম দেয়। সেই ঘুম ভাঙ্গে আবার দরজায় নকের শব্দ শুনে। এবার কিলের শব্দ আসছিলো। বাবা দরজার ওপারে আছে। উনার প্রিয়তম স্ত্রীকে দেখতে না যাওয়াই ভীষণ রেগে আছে। ছোটবেলায় বাবার হাতে অনেক মার খেয়েছি। স্পেশাল শাস্তি স্বরুপ বন্ধ ঘরে কাটাতে হতো।

দরজা খুললাম। বাবা দাঁড়িয়ে আছে। হাতে বই।

"তুই যাবি না দেখতে?"

"বাবা কয়টা বাজে?"

"দুইটার উপর বাজে। রান্নবান্না কিছু হয়নি তুই বাইরে থেকে খেয়ে হসপিটালে যা।"

আমার বাবার হসপিটালের যাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ এ্যালার্জি আছে। আম্মার যাই হওক আমি অথবা ভাইয়াকে নিয়ে যেতে হতো। কারণটা অবশ্য এখনো উদ্ধার করতে পারলাম না।

"বাবা তুমি খেয়েছো?"

"আমার কথা তোর ভাবতে হবে না।"

বাবা আজ কিছু খাবে না। উপবাস থাকবে। অবশ্য আম্মা বাসায় না থাকায় নিকোটিন নেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

আমি ভরপেট বিড়ানি খেয়ে হাজির হলাম হসপিটালে। আম্মার হুশ ফেরেনি। ভাইয়ার সাথে দেখা হলো না। প্রায় দুই ঘন্টার পর নার্স এসে খোঁজ দিলো আম্মার জ্ঞান ফিরেছে। গিয়ে দেখি আম্মা বালিশে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে। আমার আম্মা শারিরীক আর মানসিকভাবে শক্ত মহিলা। দেশের মন্ত্রী হলে বাংলাদেশী মার্গারেট থ্যাচার হতেন।

"আম্মা কেমন আছো?"

আম্মা আমার দিকে তাকিয়ে হাসি দিলো। হাত দিয়ে ইশারা করলো কাছে যেতে। আমি গিয়ে আম্মার পাশে বসলাম।

"তোর বাবা কি আসছে? তোর বাবার কি খবর?"

আম্মার অতিরিক্ত স্বামীপ্রীতি আমার কাছে বিরক্তির কারণ। উনি কই নিজের কথা বলবে তার বদলে হুশ না ফিরতে ফিরতে নিজের স্বামীর কথা জিজ্ঞেসশুরু করলো।

"বাবা ঠিক ই আছে।"

"সকালে হসপিটালে আনার সময় তুই কেন আসলি না?"
আম্মা অভিমান নিয়ে প্রশ্নটা করলো।

"আম্মা আমি যদি সকালে আসতাম তোমার জন্য মুখভর্তী গল্প কি করে বানাতাম। সারারাত এখানে তুমি পরে বোর হইতা। তাছাড়া আব্বার সাথে এক কাজ করছি ,শুনবা?"

আম্মা মাথা দিয়ে সায় দিলো। আমি আম্মাকে টান দিয়ে আমার আমার কাছে নিলাম। আম্মাকে ধরে গল্প বলা শুরু করলাম। আসার সময় বাবার রুম বাইরে থেকে নক করে দিয়ে আসি। তা আম্মাকে বলতে শুরু করলাম।

ছোটবেলা যখন অসুখ হতো ঠিক এমনিভাবে আম্মা গল্প শুনাতো। আমার আম্মার সমস্ত গল্পের কেন্দ্রিয় ক্যারাক্টার আমার বাবা। সেদিন আম্মার হিরোকে না খেয়ে কাটাতে হয়েছিলো। আসলে বাবাকে শাস্তি দিয়েছিলাম আম্মাকে না দেখতে আসার জন্য।

অন্যসব স্ত্রী হলে তার স্বামীর অবস্থা খারাপ করতো। কিন্তু আমার আম্মা আজ পর্যন্ত তার স্বামীর প্রতি সেই ভালবাসা বজায় রেখেছে।

যাক এবার আসি দাবা প্রসঙ্গে। সেদিন আমি রুমে ঢুকতে যাবো এমন সময় ভাবী হাজির।

"ভাই আমাকে বাচাও।"

ভাবী আমাদের পরিবারে এসেছে মাস দেড়েক হবে তারমধ্যে আমার দরকার লেগে গেল। আমার সুযোগ হলো ভাবীর সামনে সুপারহিরো হওয়ার। আমি সুযোগ মিস করতে চাইলাম বুক চওরা করে,প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভাবীর বিপদের পাশে দাঁড়ালাম।

"বলেন ভাবী কি করতে হবে?"

"বাবা সাথে দাবা খেলো একটু।"

"দাবা? বাবা দাবা খেলা কবে থেকে শুরু করল?"

"আর বলো না ভাই। গত কয়েকদিন থেকেই উনার সাথে সাথে খেলতে খেলতে গ্র্যান্ড মাস্টার হয়ে যাচ্ছি। সেই সকালে বসছি এখনো খেলা চলছে। আম্মাকে ঔষধ খাওয়ানোর কথা বলে আসছি।"

ভাবীর কাছে হিরো হওয়ার উদ্দেশ্যে বাবার কাছে ধরনা দিলাম। দাবায় আমি অনেক কাঁচা। ফলাফল হারলাম। তারপর থেকে যতদিন বাড়িতে ছিলাম ততদিন বাবার সাথে দুপুরে খাওয়ার পর দাবা খেলতে হত। আরাম করে আর ঘুমানোর সুযোগ হত না। অত্যাচারের সমাপ্ত ঘটলো বাবার দাবাবোর্ড চুরির মাধ্যমে।

সময় করে একদিন বোর্ড সরিয়ে নিলাম। সোজা নিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে আসলাম। বাবা বাবার শখের বোর্ড হারিয়ে শোকে কাতর। আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় কয়েক দফা। মৌন ব্রত রাখা শুরু করে। অবশেষে ভাবী নতুন বোর্ড এনে দেয়। ওই বোর্ডে বাবাকে হারায়। হেরে যাওয়ার দুঃখে উনি নিজেই বোর্ড ফেলে আসে ডাস্টবিনে।

দুপুরে ঘুমানোর ব্যপারে সারদার অনেক কমপ্লেইন ছিল। একদিন দুপুরে ঘুমাচ্ছিলাম। শুক্রবার ছিলো।বাসায় আর যাওয়া হলো না সেদিন। শুক্রবার হলো ক্যাম্পাসের প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য ঈদের দিন। এদিন তাদের দিন শুরু হয় টিএসসি থেকে আর শেষ হয় সায়েন্স ল্যাবের কোন রেস্টুরেন্ট অথবা নিলখেতের কোন বিরিয়ানি হাউজে। আজ হাকিম ও গেলো ফারজানার সাথে ডেটে। আমার থেকে ধার করা পাঞ্জাবি পড়ে গেছে সাথে দু একটা কবিতা লিখিয়ে নিয়ে গেছে জুলফিকার থেকে। বেচারা জুলফিকার আর আমি দুজনেই সিঙ্গেল। একজন কবিতা বেঁচে কারও জন্য প্রেম করার রাস্তা সুগম করে দেয় আর আরেকজন পাঞ্জাবি ধার দিয়ে। অবশ্য জুলফিকার কোন কবিতার ফি না নিলে আমি ঠিক ই আমার পাঞ্জাবির ফি নেই।

সুতরাং আদর্শ সিংগেল এর মত দুপুরে নামাজ পড়ে এসে ঘুম দিলাম। কিন্তু ঘুমটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। জুনিয়র এসে খবর দিল নিচে এক মেয়ে অপেক্ষা করছে। সারদা অপেক্ষা করছে। গেস্টরুমে গিয়ে দেখি সারদা বসে আছে।

"নামাজ পড়িস নি?"

আমাকে দেখেই সারদা জিজ্ঞেস করলো।

"হু" ছোট করে জবাব দিলাম।

"চোখ মুখ ফোলা কেন? কিছু হয়েছে নাকি? মনে ক্রু তোকে বেদম প্রহারে সিক্ত করেছে" সারদা ব্যঙ্গ করে বলল। সারদা ব্যঙ্গ করে খুব সেভেজ লেবেলে।

"না,কাচা ঘুম থেকে উঠে আসছি তাই।"

"এখন কিসের ঘুম?"

কিছু বললাম না।

"নিজের ভুড়ি যে বাড়ছে খেয়াল আছে? ভুঁড়িওয়ালা ছেলের সাথে ঘুরতে ভালো লাগে বল?"

সারদার কথা শুনে ভুড়ি কোন দিকে বের হচ্ছে সেই দিকে খুজতে লাগলাম। ঠিক ই তলপেটের কিছু অংশ বের হয়ে আছে পাঞ্জাবি ঠেলে। যাক,প্রকৃত বাঙ্গালি হওয়া শুরু করেছি তাহলে। ভূরি থাকবেনা এটা কোন কথা হলো। ভুড়ি বানাতে হবে আর ভূরিকে নিয়ে অহংকার করার মত ভুঁড়ি বানাতে হবে। শত হলেও ভূড়িই আমাদের অহংকার।

"তুই তোর প্রেমিকের সাথে ঘুর না। আমাকে ঘুমাতে দে।" আমার কথা শুনে চুপসে গেলো সারদা। বরাবর ওকে আঘাত করতে গিয়েও পারি না। বারবার ব্যর্থ হয়। সারদা মাথা নিচু করে রাখলো। আমার চোখ ঘুমে ফেটে যাচ্ছিলো।

"কি বলতে আসছিলি বল।"

"কিছুনা" সারদা মাথা নিচু করে বের হয়ে গেলো হল থেকে। সেদিন রাতে রাতে ঘুম হয় নি আমার। আনুশোচনায় ভুগছিলাম আমি। বুঝতে

পারেনি সমস্যাটা কোথায় ছিল। পরেরদিন শুনি ওর শরীর খারাপ। হসপিটালে ভর্তী। তারপর থেকে দুপুরে ঘুমাই না ভুঁড়ি বাড়ার ভয়ে।

"স্যার মনে হয় প্রচুর বৃষ্টি হইবো।"

খুরশিদ আলমের কথা শুনে বাইরে তাকালাম। আকাশে প্রচুর মেঘ জমছে। উত্তর দিক থেকে সমস্ত মেঘ এসে দক্ষিণ দিকে জমছে।

"মনে তো হচ্ছে। তাড়াতাড়ি চলো। নাহয় আবার বৃষ্টির পানিতে আটকে থাকতে হবে আল্লাহয় জানে!"

"কোনমতে স্যার নতুন বাজার পার হইতে পারলেই হয়।"

এতক্ষণ খুরশীদ আলমকে জিজ্ঞেস করা হয়নি ,ওই রোড ছেড়ে এই রোড দিয়ে কেন আসলো। মহাখালী দিয়ে গেলে এতক্ষণে বিমানবন্দর থাকতাম।

"মহাখালি দিয়ে গেলে কি হত?"

"স্যার ওই রোডে তো প্রচুর জ্যাম। রাস্তা মেরামত করছে তো তাই গেলাম না।"

দিন দিন কুনোব্যাঙ হয়ে যাচ্ছি। অনেকদিন হলো ঐদিকে যাওয়া হয় না। একবার সময় করে যেতে হবে।

"স্যার গ্যাস শেষ হয়ে গেছে।"

আজই কি সব বিপদ আসার কথা। রবীন্দ্রনাথ আমার সাথে আটকে আছে এতক্ষণ যাবত। কখন যে মুক্তি পায় সেটার কোন ঠিক ঠিকানা দেখছি না।

"গ্যাস ভড়ে নাও।"

আট

দিনটা ছিলো ২২ শে শ্রাবণ। আজকের মত বৃষ্টিহীন ছিল না। সকাল থেকেই প্রবল বৃষ্টি হয়। রাস্তায় হাটু সমান পানি। বাসা থেকে ভার্সিটি আসা পর্যন্ত অনেক ধকল গেছে আমার উপর দিয়ে। গেঞ্জি প্রায় ভেজা। খাতাপত্র ভিজে গেছে। ক্লাসে এসে দেখি ক্লাস ফাকা। কেউই নেই। অফিসরুমে গিয়ে জিজ্ঞেস করার পর জানতে পারি বৃষ্টির জন্য ক্লাস বাতিল। সেমিনারে গিয়ে দেখি অনেকেই বসা। হাকিমকেও দেখলাম। বইয়ে মাথা ঢুকিয়ে পড়ছে। আমি গিয়ে হাকিমের পাশে বসলাম। হাকিম এত মনযোগ দিয়ে পড়ছিলো যে আমি গিয়ে যে তার পাশে বসছি সেটা সে বুঝতে পারেনি। আমি নিয়ে আসছিলাম তারাশংকরের বই "কবি" । আজ কয়েক দিন হল আমার ব্যাগের কোনে অথবা পকেটে ভর্তী থাকে। সময় পেলে পড়ি।

"কি রে তুই এখানে?" হাকিম নিচু গলায় বলল।

"ক্লাসে আসছিলাম।"

"ওহ,ক্লাস তো হবে না আজ। "

"ওহ ,আচ্ছা। জানতাম না তো জানানোর জন্য ধন্যবাদ।"

হাকিম তার হাতের বইটা বন্ধ করল। লাইব্রেরিয়ান এর কাছে জমা দিয়ে আসলো।আমি এখনো কবি নিয়ে আছি।

"চল ডাকসুতে যাই" হাকিম বলল।

"হঠাত ডাকসুতে কেন?"

"আরে আয় না ভাই। জরুরি কাজ আছে।"

কি আর করা হাকিমের পিছন পিছন রওনা দিলাম ডাকসুর উদ্দেশ্যে। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। নিচে নেমে দেখলাম অবস্থা ভাল না। যে কোন সময় বৃষ্টি হতে পারে। সেমিনার অথবা ক্লাসরুমে বসে থাকাকে সেইফ মনে করলাম।

"তুই যা,কিছুকক্ষণ আগে বৃষ্টিতে ভিজে আসছি। এখন ভিজতে পারবো না।"

"রিকশা নিচ্ছি" হাকিমের কথা শুনে অবাক হলাম। ঐটাই ছিল হাকিমের প্রথম ও শেষবারের মত আমাকে অবাক করে দেয়ার মত কিছু। যেই ছেলেটা এক টাকার সিগারেট এর জন্য মাথা খেয়ে দেয় সেই ছেলেটা এনেক্স থেকে ডাকসুতে যাবে রিকশা করে। আমার অলরেডি কিছু কাপড় এখন তার দখলে ছিলো। জুতো পর্যন্ত বাকী ছিলো না।

"ভাই কিছু ঘটছে?"

হাকিম আমার কথা শুনে মুচকি হাসলো।

"অনেককিছুই ঘটে গেছেরে তোর ভাই তো প্রেমে পড়ছে।"

"তো তুই প্রেমে পড়ছিস এখানে আমার কি কাজ?"

"মেয়েটাকে পটাতে সাহায্য করবি না তুই। তুই আমার ভাই না। ভাই হইয়া যদি সাহায্য না করিস তাহলে কে করবে।"

রিকশা এসে থামলো ডাকসুর সামনে।

"বস তুই,আমি নাস্তা নিয়ে আসছি।"

হাকিম চলে গেল। আমি বসার জন্য খালি চেয়ার খুঁজতে লাগলাম। কোথাও খালি পেলাম না। বাইরে এসে বারান্দায় বসলাম দেয়ালে ঠেলান দিয়ে। দূর্জয় পশ্চিম পড়া শুরু করলাম। মনযোগ দিয়েই পড়ছিলাম। হঠাত করে একটি গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। প্রথমে আওয়াজটা ক্ষীণ ছিল।

সুতরাং গুরুত্ব না দিয়ে বই পড়ায় আবার মনোনিবেশ করলাম। কিন্তু আস্তে আস্তে আওয়াজটা বাড়তে লাগলো।

বই বন্ধ করে দিলাম। আওয়াজটা বুঝার চেষ্টা করলাম।
আস্তে আস্তে কানে আসতে লাগলো।

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে
হৃদয় রয়েছে গোপনে।
বাসনা বসে মন অবিরত
ধায় দশ দিশে পাগলের মত .....

মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে লাগলাম। মাথা তুলে দেখি আমার থেকে একটু দূরেই একটা মেয়ে বসে আছে। মেয়েটা মাথায় সাদা সেলওয়ার কামিজ পড়ে আছে। ওড়না দিয়ে এমনভাবে মাথা ঢেকে আছে যে মুখ দেখা যাচ্ছে না। মাথা নিচু করেই গান গায়ছিলো। দুই পা জড়িয়ে রেখেছে বুকের সাথে। আমি মেয়েটির বামপাশে। মেয়েটির বাম পাশটায় দেখতে পারছিলাম। বাম পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি গাঢ় করে আলতা দেওয়া। আমি এর আগে কোন মেয়েকে আলতা দিতে দেখিনি। ওইটাই ছিলো প্রথম।

বাইরে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। একটু পর ঠান্ডা বাতাস এসে শরীরকে ঠান্ডা করে দিয়ে দিচ্ছে। সময়টা থমকে গিয়েছিলো। আমি আর মেয়েটি ছাড়া আর কিছুই মনে হলো না আছে। মনে হলো দুজনে পাশাপাশি বসে আছি অনন্তকাল ধরে যেখানে সময়ের কোন অস্তিত্ব নেই। কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানিনা তবে আমার মনে হয়েছিলো আমি ওই মেয়েটির পাশে অনন্তকাল বসে কাটিয়ে দিতে পারবো।

"তুই এখানে আর আমি তোকে সমস্ত ক্যাফেটেরিয়াই খুঁজে বেড়াচ্ছি" হাকিমের কথায় বাস্তবতায় ফিরলাম।

মেয়েটির থেকে হাকিমের দিকে দৃষ্টি ফেরাই। হাকিম দাঁড়িয়ে আছে সিঙ্গারা আর চা নিয়ে। আমি মেয়েটির দিকে তাকাতেই দেখি মেয়েটি নেই। হন্য হয়ে খুঁজতে লাগলাম।

মেয়েটির মত কাওকে দেখতে পেলাম না বাইরে। ছুটে ক্যাফেটেরিয়ার ভিতরে গেলাম। ক্যাফেটেরিয়ার প্রত্যেকটি টেবিল,প্রত্যেকটি কোনা খুঁজলাম। না মেয়েটিকে খুঁজে পেলাম না। হাকিম আমার পিছনে পিছনে আসলো। হতাশ হয়ে বসলাম। হাকিম নাস্তাগুলো টেবিলের উপর রাখল। সিংগারায় কামড় বসিয়ে বলল" কি হইছে?কাকে খুজতেসিস?"

"মেয়েটাকে। দেখছিস কোন দিকে গেছে?"

"প্রেমে পড়ছিস নাকি?"

চুপ থাকলাম। প্রেমে পড়া বলতে কি সেটা কি তখন বুঝতাম না। আমরা যখন প্রেমে পড়ি আমাদের কি হয়? বুকে মানুষটার জন্য শূন্যতা ফিল করি। তাকে একবার দেখার জন্য ছুটে যায়। তার সমস্ত ইচ্ছে পূরণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি। তার জন্য ইচ্ছে হয় চাদটাকেও নামিয়ে নিয়ে আসি। সেই সময় ওই অপরিচিত সেই মেয়েটির জন্য আমি এমন কিছুই ফিল করেনি। তবে কেন জানি মনে এই মেয়েটির সাথে আর একবার অন্তত দেখা হওয়া দরকার নাহয় কিছু একটা আমার জীবনে অপূর্ণ থেকে যাবে।

"তোর প্রেমিকা কই" কথা পাল্টানোর জন্য বললাম। হাকিম সিংগারা শেষ করল। আমিও একটা নিয়ে কামড় দিলাম। চায়ে চুমুক দিয়ে দেখি চা একদম ঠান্ডা।

"প্রেমিকা কই হলো। পটানোর চেষ্টা করছি।"

"মেয়েটা কে?"

"ফারজানা। বাংলা বিভাগের।"

"প্রপোজ করছিস?"

"আর প্রপোজ। ভাল করে কথায় বলতে পারি না।"

"প্রপোজ করে দে। "

"মেয়ের দেশের বাড়ি বরিশালের। চাটগাইয়ার সাথে কি আর প্রেম করতে যাবে?"

"ওহ"

হাকিম দাঁড়িয়ে গেলো। ভাবলাম কি না কি হলো। আমিও হাকিমের দেখাদেখি দাঁড়িয়ে গেলাম। মাথা ঘুরিয়ে সমস্ত ক্যাফেটেরিয়ায় দেখলাম। হলের কোন বড় ভাই,রাজনৈতিক নেতা অথবা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম না। আমি বসে পড়লাম। হাকিম এখনো দাঁড়িয়ে আছে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করলাম। সামনে দেখলাম একটি টেবিলে কয়েকজন ছেলেমেয়ে বসে আছে। সেই টেবিলের দিকে হাকিম তাকিয়ে আছে। আমি হাকিমের শার্ট ধরে টান দিলাম। হাকিম বসে পড়লো।

"ফারজানা" হাকিম টেবিলের উপর ঝুঁকে বলল। আমি আমার টেবিলের দিকে তাকালাম। তিনজন মেয়ে বসে আর দু জন ছেলে। এর মধ্যে ফারজানা কোনটা সেটা বুঝতে পারছি না।

"ফারজানা কোনটা?" হাকিমকে প্রশ্ন করলাম।

"ওইযে বেগুনি শাড়ি পড়া মেয়েটা। "

এবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে ফারজানাকে দেখলাম। মেয়েটা প্রেমে পড়ার মত মেয়ে। হাসি দিয়ে সবার সাথে কথা বলছে। মাঝেমধ্যে দু হাত নাড়ছে। মেয়েটা হাসি দিলেই গালে টোল পড়ে। হাকিমের পছন্দ আছে বটে। কিন্তু আমার এভারেজমার্কা বন্ধুটাকে সেই মেয়েটা পছন্দ করবে কি না সেটা ও ভাবার বিষয়।

"এখন কি করবো। প্রতিদিন ই এখানে ছুটে আসি। দূর থেকে দেখছি। কিন্তু কথা বলার সাহস পাচ্ছি না" হাকিম বলল।

"আমি পরিচয় করিয়ে দিবো। এক প্যাকেট সিগারেট দিবি। বেনসন দেওয়া লাগবে।"

সিগারেট এর পয়সা জোগার করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয়। নতুন বইয়ের বদলে পুরাতন বই কিনতে হয়। সুতরাং সুযোগটা হাতছাড়া করা যাবে না।

"তুই কি করে পরিচয় করাবি?তুই চিনিস নাকি?"

"আচ্ছা ভাই। তাহলে তুই দূর থেকে দেখেই পার কর আমি যায়" আমি উঠে দাড়ালাম। হাকিম আমার হাত ধরে টান দিয়ে আমাকে আবার বসালো।

"ওকে ডান।"

দুইজন ছেলের মধ্যে একজন আমার প্রাক্তন কলেজের ক্লাসমেট। মানবিক বিভাগের মাসুম। তার জেরেই এখন পরিচয় হবো। সেদিন মাসুমের মাধ্যমে ফারজানার সাথে হাকিমের পরিচয় করিয়ে দেয়। সিগারেট এর প্যাকেট পাই তিন মাস পর। ফারজানা আর মাসুম আজ চার বছর হলো একসাথে।

ওদের সাথে আড্ডা দিচ্ছিলাম। সবাই আড্ডাতে ব্যস্থ। কিন্তু আমার চোখ সেই অপরিচিত মেয়ের খোঁজে ব্যস্ত। কানে শুধু বাজছিলো

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে
হৃদয় রয়েছে গোপনে...

সেদিন এর পর থেকে অপরিচিতাকে খুঁজতে লাগলাম। সময় পেলে কলাভবনের এই দিকে যেতাম। প্রহর গুণতে গুণতে প্রায় এক সপ্তাহ চলে গেল। আমি অপরিচিতার সন্ধান পেলাম না। হঠাত একদিন ক্লাসে এক মেয়ে এসে হাজির। সবার মত আমিও মেয়েটাকে দেখতে লাগলাম। চেনা মনে হল কিন্তু মনে করতে পারছিলাম না। ফাস্ট বেঞ্চে বসে থাকা আসফাকের কাছে মেয়েটা গেল। কি যেন বলল। মনে করেছিলাম

আশফাকের কেউ হবে। না একটু পর আশফাক আমার দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করলো। মেয়েটা আমার দিকে তাকালো আমিও তাকালাম। চোখে চোখ পড়লো। মেয়েটা লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে ফেলল।

"এইদিকে আয়। উনি তোকে খুঁজছে?" আশফাক বলল। আশফাকের কথায় বেঞ্চ থেকে উঠে আসলাম। ক্লাশের সবাই বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া শুরু করল। আমি আর চারিপাশ না তাকিয়ে সোজা মেয়েটার কাছে গেলাম।

"একটু বাইরে আসা যাবে?"

মেয়েটার গলা শুনে চমকে উঠে থাকালাম। মেয়েটার চোখের দিকে তাকালাম সোজা। চিকন করে কাজল দেওয়া মেয়েটার চোখে। এমন মায়াভরা চোখ আমি আর কখনো দেখিনি। মনে হলো এই দুইটি মায়াভরা চোখের দিকে কাটিয়ে দিতে পারবো জীবন। এই প্রথম কোন মেয়ের চোখের দিকে ইচ্ছে করে তাকালাম। বুঝতে পারলাম বেয়াদবি করে ফেলছি। চোখ নামিয়ে ফেললাম। যেই মেয়েটাকে খুজছি এতদিন ধরে সেই মেয়েটা আমার সামনে।

"বলুন কি দরকার?" বলার সময় আমার গলার স্বরটা কেপে উঠেছিল।

"একটু বাইরে আসুন" মেয়েটা আস্তে করে জবাব দিয়ে বের হয়ে গেল। আমিও মেয়েটাকে অনুসরণ করলাম। মেয়েটা এসে সিঁড়িতে বসলো। আমি সংকোচ নিয়ে মেয়েটার কাছে এসে দাড়ালাম।

মেয়েটা তার ব্যাগ খুলল। একটি বই বের করলো। বইটি ছিল তারাশংকরের "কবি। " সেদিন ভুল করে ডাকসুতে ফেলে দিয়ে আসছিলাম।

"এই নিন ,ফেলে দিয়ে আসছিলেন।"

মেয়েটা বই বের করে দিয়ে বলল। আমি মেয়েটার হাত থেকে বইটা নিলাম। মেয়েটার হাতের দিকে চোখ গেল। হাতভর্তী কাচের চুড়ি। কোন সুনির্দিষ্ট রং এর চুড়ি নেই। অনেক রঙ এর চুড়ি দেখলাম। কালার ব্লাইন্ড হওয়াই সাদা আর কাল ছাড়া অন্য কোন রঙ বুঝতে পারলাম না। ইচ্ছে

হলো মেয়েটাকে চমকে দিতে। মাঝেমধ্যে অতিরিক্ত রুপবতীদের চমকে দিতে ভালো লাগে। যখন চমকে যায় তখন ওদেরকে বেশি রূপবতী লাগে।

তেমন এক রূপবতী ছিল মিলা আপু। প্রথম বর্ষের নবীনবরণ। হাকিমের সাথে আমিও গেলাম টিএসসিতে নবীণবরণ অনুষ্ঠানে। প্রথম বর্ষের ছাত্র হিসেবে অন্যান্য বর্ষের ভাইয়া-আপুরা অত্যন্ত স্নেহ করল। কালচারাল অনুষ্ঠান হলো। প্রথম বর্ষ থেকে অনেকে অংশগ্রহন করল। হাকিম আইয়ুব বাচ্চুর "এক আকাশের তারা" গাইলো। দ্বিতীয় বর্ষ তারপর তৃতীয় বর্ষের এরাও পারফর্ম করল। তারপর আসলো বিদায়ী ব্যাচ চতুর্থ বর্ষ।

চতুর্থ বর্ষের অনুষ্ঠান শুরু হলো মিলা আপু দ্বারা। আপু শাড়ি পড়ে আসছিল। লাল শাড়ি ,ঝকঝকে লাল না হালকা লাল। মাথায় স্কার্ফ বাধা। চেহারার থেকে বিশেষ মায়া আসতে শুরু করলো। সেদিন আপুর মায়া আর রূপের কাছে বিদ্ধ হয়েছিলাম আমিও। আপু রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে বের হয়ে গেল। আমিও বের হয়ে গেলাম।

"আপু দাঁড়ান" পিছন থেকে ডাক দিলাম।

আপু দাঁড়াল। আমি আপুর কাছে গেলাম।

"কি বলবা বলো ভাইয়া?"

"আপু আপনাকে যদি বলি আপনি খুব সুন্দর আপনি কি মাইন্ড করবেন" মাথা নিচু করে বললাম। ভাবলাম আপু ধমক দিবে। ধমক খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

"না ভাইয়া মাইন্ড করবো না।"

আপুর কথা শুনে মাথা তুললাম। আপু হাসি দিয়ে আছে আমার দিকে তাকিয়ে।

" আপু আমি যদি বলি যে কেউ আপনার প্রেমে পড়বে আপনি কি মাইন্ড করবেন?"

আপু এখনো হাসি দিয়ে আছে। সব মানুষ মুখে এতক্ষণ হাসি ধরে রাখতে পারে না। হাতেগুনা কয়েকজন আছে যারা চরম বিরক্তিতেও মুখে হাসি ধরে রাখে।

" না ভাইয়া। তোমার আপু এত সহজে মাইন্ড করে না?"

"আপু আমি যদি বলি আমি আপনাকে ভালবাসি আপনি কি মাইন্ড করবেন?"

এবার আপু আমার কথা শুনে অট্টহাসি দিলো। সেদিন বোধ আপুর সবকিছুর উপর প্রেমে পড়া আমার কপালে লিখা ছিলো আপুর অট্টহাসির ও প্রেমে পড়ে গেলাম।

"তোমার প্রেমিকার অভাব হবে না। যেভাবে ফ্লার্ট করছো যদি বিয়েটা না করতাম তোমার প্রেমে পড়ে যেতাম" আপু আমার মাথায় হাত দিয়ে বলল।

"ভাইয়া তো একটূ আগে একসিডেন্ট করলো সো আমি আছি। ট্রাই করতে পারেন।"

আপু হাসি থামিয়ে দিলো। আপু চমকে উঠেছে। তার মুখে একরাশ বিষ্ময় ফুটে উঠলো। বিষ্ময়ের পর বেদনার ছাপ ফুটে উঠবে। সেটা না হওয়াই ভালো।

"আপনার রূপে এক্সিডেন্ট করেছে।"

আপু আবার হেসে উঠলো।

আমার সামনে বসা এই মায়াবতীকেও চমকে দেওয়ার ইচ্ছে হয়েছিলো। চমকে দেওয়ার জন্য হঠাত করে আমার মাথায় কোন আইডিয়া আসে না। আমার খালাতো ভাই সোহেল। সোহেল ভাইয়ের এই গুণটা আছে। মানুষকে সে ভালো চমকাতে পারে।

"আপনার হাতের লেখা তো অনেক বাজে।"

মেয়েটার কথা শুনে আমি চমকিয়ে উঠলাম। সরাসরি অপরিচিত একটা মানুষকে কেউ এভাবে বলে না। অপরিচিত কাওকে মানুষ সাধারণত তার দোষ বলে না গুণ বলতে পছন্দ করে।

"জ্বি হয়ত।"

মেয়েটি তার ব্যাগের চেইন লাগাল। আমি সেই চেইন লাগানো দেখলাম। চেইন লাগিয়ে ওড়না একটু ঠিক করে নিল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল "একটা ধন্যবাদ তো দিতে পারেন।"

আমি লজ্জা পেলাম। লজ্জা পাওয়ার ই কথা। মেয়েটা এত কষ্ট করে আমাকে আমার বইটি পৌছে দিল অথচ মেয়েটিকে আমি এখন পর্যন্ত ধন্যবাদটুকু জানালাম না।

"ধন্যবাদ"

"এত বেখেয়ালি কেমনে হলেন?"

মেয়েটার কোন সংকোচ ফিল করছেনা একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছে। আমার উচিত মেয়েটাকে অপমান করা কিন্তু আমি কেন যে করতে পারলাম না।

" বেখেয়ালি না হলে তো আপনি এই বেখালি ছেলেটাকে দেখতে পারতেন না।"

"মানে?"

"কিছু না"

"আচ্ছা আপনি কি অপদার্থ?"

আমার মনে হয় কোন ছেলে এরকম প্রশ্নের মুখোমুখি কখনো হয়নি। কেউ জিজ্ঞেস করে কাওকে অপদার্থ মনে করে না। সরাসরি অপদার্থ মনে করে। এই মেয়েটা এমন প্রশ্ন করছে যেটার উত্তর আমার জানা নাই।

"আপনার কি প্রেমিক আছে?"

ভেবেছিলাম মেয়েটা চমকাবে।

"কেন ,সিঙ্গগেল থাকলে কি আপনি প্রেম করতেন?" মেয়েটার জবাব শুনে আমিই চমকে গেলাম। মেয়েটা আর অপেক্ষা করেনি আমার জবাবের জন্য। মেয়েটি সিড়ি দিয়ে নেমে নিচে নেমে গেলও।

"আপনার নাম কি?"

"সারদা"

নয়

পেট্রোল পাম্পের সামনে একটা গাড়ি পার্ক করা। গাড়িটা ঘেঁষে একটা পুরুষ দাঁড়ানো। গায়ে ফ্লানেলের শার্ট,চোখে কালো চশমা। ভুরি ফ্লানেলের শার্ট চিরে বের হয়ে আছে। লোকটাকে চেনা চেনা লাগছে। বিশাল লাইন লেগে আছে। খুরশিদ আলমের সিএনজি অনেক পিছনে। আধঘন্টার আগে সম্ভব হবে না। বৃষ্টি হবে হবে করেও হচ্ছেনা। মনে হয় আজ আর বৃষ্টি হবে না। রবীন্দ্রনাথ এখন লাইনে আছে। ভীষণ ভেজালে পড়ে গেল বেচারা রবীন্দ্রনাথ। একের পর এক বিপদে এসে আজ জুটছে আমার আর রবীন্দ্রনাথের কপালে।

লোকটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় গাড়িতে ফুয়েল ভরার জন্য উনি আসেনি। অন্য কোন মতলবে এসেছে। লোকটার সাথে কথা বলতে অনেক ইচ্ছে হচ্ছে। আমি ইচ্ছের বিরুদ্ধে এই পর্যন্ত কিছু করতে পারিনি। আমার সেলফ কন্ট্রোল লেবেল একদম শূন্য।

আমি লোকটার দিকে যতই এগুচ্ছি লোকটার চেহারা তত বোঝা যাচ্ছে। লোকটার পাশে এসে দাড়াতেই বুঝি মজিদ ভাই।

"আসসালামু আলাইকুম ভাই।"

মজিদ ভাই আমার দিকে তাকালো। মানুষটার সাথে প্রায় দুই বছর পর দেখা। দুই বছরে একটা মানুষের এত পরিবর্তন হয়! চেহারা থেকে যৌবনের ছাপ মুছে ফুটে উঠেছে বার্ধক্যের ছাপ। মজিদ ভাই আমাদের পাশের রুমেই থাকতেন।

"আরে তুমি? কতদিন পর দেখা।"

মজিদ ভাই হ্যান্ড শেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলো। আমি মজিদ ভাইয়ের সাথে হাত মেলালাম।

"কেমন আছেন ভাই? "

"আলহামদুলিল্লাহ ,তুমি ?"

"ভালো। এখানে কি করছেন?"

মজিদ ভাই ফ্লানেলের শার্ট থেকে সিগারেট এর প্যাকেট বের করলো। ক্যাপিস্টান সিগারেট।

"নিবে নাকি একটা?"

ভাই সিগারেট এর প্যাকেট এগিয়ে দিল। একটা সিগারেট তুলে নিলাম। মজিদ ভাই দিয়াশলাই এগিয়ে দিলো। সিগারেটটা ধরিয়ে নিলাম।

" তা এখানে কি করে?"

"এইতো একটু উত্তরা যাচ্ছিলাম।"

"উত্তরা কেন?"

"রবীন্দ্রনাথকে ডেলিভারি দিতে। "

মজিদ ভাই আমার কথা শুনে সিগারেট টানা অফ করে দিল। চোখগুলু সরু করে নিল।

"বুঝলাম না?"

“রবীন্দ্রনাথের অস্তি চুরি করে নিয়ে আসছি। তা এখন উত্তরায় কালোবাজারিদের কাছে নিলামে তুলবো।”

মজিদ ভাই ভাবলেশহীন।

“রসিকতা তো ভালোই শিখেছো। উত্তরায় কই যাবা?”

আমি পকেট থেকে সারদার চিঠিটা বের করলাম।

বাসা ১২/বি,রোড নং -৭ বি ব্লক উত্তরা

এড্রেসটা পড়ে শুনালাম। মজিদ ভাই আমার হাত থেকে টান দিয়ে চিঠিটা নিয়ে নিল। ঘটনার আকস্মিকতায় অবাক হয় গেলাম। মজিদ ভাইয়ের চোখে দুষ্টুমির হাসি ফুটে উঠলো। ভাই চিঠিটা উল্টিয়ে পালটিয়ে কয়েকবার দেখলো। আমি হা করে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

“স্যার আপনারে খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত আমি। আর আপনি এখানে’ ’ খুরশিদ আলম এসে বলল। খুরশিদ আলমের কপালে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝড়ছে। মনে হচ্ছে অনেক ছোটাছুটি করেছে।

“কি অবস্থা বলো খুরশিদ আলম?”

“স্যার চলেন। “

“উনি কে?” মজিদ ভাই বললেন। খুরশিদ আলম সেই প্রথম থেকেই ভয়ে কুচকে আছে। মজিদ ভাইকে দেখে তার অবস্থা আরও খারাপ।

“উনি খুরশিদ আলম। সি এন জি ড্রাইভার।”

মজিদ ভাই আমার কথা শুনে চোখ কুচকে ফেললেন।

“চলো আমার সাথে। আমার সাথে যাবে। আমিও ওইদিকে যাচ্ছি” মজিদ ভাই বললেন।

উনি উনার পার্ক করা গাড়িটার দিকে তাকালেন। বাহ! ভালই তো। এবার মজিদ ভাইয়ের সাথে আয়েশ করে যাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথ ও একটু আয়েশ করে যেতে পারবে।

মজিদ ভাইয়ের কথা শুনে খুরশিদ আলম আমার দিকে তাকালো। তার মুখ শুকনো। আমি পকেটে হাত দিয়ে টাকা বের করলাম। টাকা গুণে দেখি ২৫০ টাকার মত বাকী। আমি পঞ্চাশ টাকা পকেটে ঢুকিয়ে নিলাম। বাকী টাকা খুরশিদের দিকে বাড়িয়ে নিলাম।

"এই নাও খুরশিদ, ভাড়া নিয়ে বিদেয় হও। আর আমি ডিবি অফিসার না সাধারন পাবলিক।"

ভেবেছিলাম খুরশিদ আলম হয়ত এই কথা শুনার পর গালি দিবে। নয়ত তেড়ে আসবে মারতে আর তাকে সাপোর্ট করার জন্য অন্যান্য সি এন জি ওয়ালারা আসবে। আমাকে বাঁচাতে মজিদ ভাই আপ্রাণ চেষ্টা করবে। মজিদ ভাই যখন ব্যর্থ হবে তখন ছুটে যাবে কোন পুলিশের কাছে। কোন ভাড়ি পেট ওয়ালা পুলিশ এসে ঘন ঘন হুইসেল মারবে। তার হুইসেল এর আওয়াজ শুনে আশপাশ থেকে পুলিশ এসে জড়ো হবে। তাদেরকে দেখে সবাই চলে যাবে।

কিন্তু খুরশিদ আলম দাঁড়িয়ে গালাগাল দিবে। কয়েকজন সিএনজি ড্রাইভার তাকে শান্ত করার চেষ্টা করবে। কিন্তু এমন কিছুই ঘটলো না।

খুরশিদ আলম আমার হাত থেকে টাকাটা নিয়ে নিলো।

"বইগুলা এনে দিয়ে যাও ?"

খুরশিদ আলম চলে গেল।

"বই ডেলিভারি দিতে যাচ্ছো নাকি?"

"হা ভাই। রবীন্দ্রনাথের বই?"

"কার এখানে যাচ্ছো?"

"জানিনা ভাই"

"না জেনেই যাচ্ছো।"

আমি চুপ থাকলাম।

"কে এই দায়িত্ব দিলো তোমাকে?" মজিদ ভাই গাড়ির দরজা খুলে ভিতরে বসলো। আমিও উনার পাশে বসলাম।

"সারদা"

"সারদা কে?"

এই প্রশ্নটার মুখমুখি অনেকবার হয়েছি। বেশিরভাগ হাকিম এই প্রশ্ন করেছে হাকিম। প্রথমত হাকিমকে জবাব দিতাম "কি আর হবে! বন্ধু।" প্রথমদিকে হাকিমকে এই উত্তর দিয়ে এড়িয়ে যেতাম।

কিন্তু আস্তে আস্তে সময় বাড়ার সাথে সাথে হাকিমের কাছে আর এই উত্তর দিয়ে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হলো না।

দুই মাস আগের কথা। আমি বসে আছি ভিসি চত্বরে। আসলে অপেক্ষা করছিলাম একজনের জন্য। বই এক্সচেঞ্জ করবো। প্রত্যেক সপ্তাহে মেয়েটির সাথে বই বদল করি। মেয়েটি ইকোনমিক্সে পড়ছে। কয়েকমাস মাস আগে বাংলা একাডেমিতে এশার সাথে পরিচয় হয়। আমার ছোটবেলা থেকে থৃলারের প্রতি বিশেষ ঝোক। তা বড় হয়েও যায় নি। সেই প্রেক্ষিতে এশার সাথে পরিচয়।

ডায়াসে উঠে বক্তব্য রাখছে ইমদাদুল হক মিলন। বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের আগমন আবদুল ওদুদের প্রয়াণদিবস উপলক্ষে। আমি এসেছিলাম বই কিনতে। এসে দেখি বাংলা একাডেমীর প্রাঙ্গনে বিশাল ভীড়। একজনকে জিজ্ঞেস করে খবর প্রায় আবদুল ওদুদের মৃত্যুদিবস উপলক্ষে বাংলা একাডেমী বিশেষ আয়োজন করেছে। সেই আয়োজনে অনেক গুণীরা বক্তব্য রাখবে। সদ্য দেশে ফেরা এই সময়ের জনপ্রিয় লেখক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও এসেছে।

অনুষ্ঠানে হাজির হলাম আমিও। বসেছি একদম শেষ সারিতে। অনুষ্ঠান শুরু হয় সাংস্কৃতিক মন্ত্রীর ঝাঁঝালো বক্তব্যের মাধ্যমে। তারপর গণ্যমান্য অনেকেই বক্তব্য রাখা শুরু করলেন। সবাই আব্দুল ওদুদকে পাশে রেখে নিজ ব্যক্তিগত সাফল্য আর অটোবায়োগ্রাফি বলছে। ব্যাগে ছিলো অগাথা ক্রিস্টির "And then there were none."

নিলক্ষেত থেকে দুই দিন আগে ৭০ টাকা দিয়ে কিনেছি। খুলে পড়া শুরু করলাম। বইয়ে ভালই মগ্ন ছিলাম।

"অগাথা ক্রিস্টির বই ভীষণ বিরক্ত লাগে!"

কথা শুনে মনযোগ ভাঙল। মেজাজ গরম হয়ে গেল। পাশে ফিরে দেখি এক নিকাব পড়া মেয়ে বসে আছে। মাথায় মুখোশ পড়া।

হাতে কালো মোজা। মেয়েটিকে দেখে দাদীর কথা মনে পড়লো। সোবহান চাচার আম্মা। উনাকে আমি কখনো দেখিনি বাইরে বের হলে নিকাব ছাড়া বের হতে।

একদিন তো বিশাল ঝামেলায় পড়লাম এই নিয়ে। দাদীর শরীর খারাপ। দাদীকে ঢাকা আনা হলো। ডাক্তার দেখানো হবে। উনাকে ডাক্তারের কাছে নেওয়া হলো। উনার লিভার কাজ করা বন্ধ করে দিলো। ডাক্টার টেস্ট দেয় ।

টেস্ট করার জন্য উনাকে পরিক্ষাগারে ঢুকানো হলো। যিনি টেস্ট করবেন উনি একজন পুরুষ ডাক্তার ছিলেন। আমরা সবাই অপেক্ষা বাইরে করতে লাগলাম। একটু পর ডাক্তার ফিরে আসলো। তার মুখে ভীষণ বিরক্তির ছাপ।

"উনাকে বোরকা খুলতে হবে আল্ট্রাসনোগ্রাফি করাতে হলে। আর উনি রাজি হচ্ছেন না" ডাক্তার সাহেব চাচার সামনে এসে বলল। চাচা লজ্জিত বোধ করলো।

"আপনি আমার সাথে চলেন।"

চাচার সাথে আমিও গেলাম। দাদী বেডে শোয়া। ডাক্তারসাহেব দরজা সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো।

"আপনারা যান আমি পিছন পিছন আসছি।"

ডাক্তার সাহেবের কথায় কিছু বুঝতে পারলাম না। চাচা প্রথমে ঢুকলো। তারপর আমি তারপর ডাক্তার সাহেব।

"এই শয়তান পোলারে এখান থেকে ভাগা। এই শয়তান পোলা আমারে উদাম করতে চায়। ওরে ভাগা।"

ডাক্তারের দিকে আঙ্গুল তুলে দাদী বললেন। ডাক্তার ভয়ে কাচুমাচু হয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। চাচা দাদীর কাছে গেলেন।

"আম্মা কি হইছে?" দাদীর হাত ধরে চাচা বললেন।

"এই পোলা কয় আমার বোরকা খুলতে!"

চাচা দাদীর কথা শুনে ডাক্তারের দিকে তাকালেন।

"বোরকা না খুললে আল্ট্রাসনোগ্রাফি কি করে করবো?"

"আমারে ঝাড়ু আইনা দে। ওরে পিটাইয়া ভূত ছাড়াই। লুচ্চা পোলা কোথাকার।"

দাদিকে অনেক কষ্ট করে শান্ত করলাম। সেই সময় খুব কম মহিলা ডাক্তার ছিলো যারা আল্ট্রাসনোগ্রাফি করাতো। আমার দাদী কিছুতেই রাজী হলেন না বোরকা খুলতে। অবশেষে নিরুপায় হয়ে ভাইয়া তার প্রফেসরকে অনুরোধ করায় উনি এসে আল্ট্রাসনোগ্রাফি করেন।

আমি মেয়েটির কথায় কোন গুরুত্ব না দিয়ে। আবার বই পড়ায় মনযোগী হলাম।

"প্যাটারসন পড়েন?"

মেয়েটির কথায় আবার মনযোগ ভাঙল। আবার বিরক্ত হলাম। "না পড়িনি। আপনি এখন বিরক্ত করা বন্ধ করলে এটা পড়বো" আমি বইটি হাতে নিয়ে মেয়েটিকে দেখিয়ে বললাম।

ভাবলাম মেয়েটি আর বিরক্ত করবে না। আমাকে অবাক করে দিয়ে মেয়েটি বলল, "অ্যালং কেইম উইথ এ স্পাইডার পড়তে পারেন।"

মেয়েটি তার কালো চামড়ার ব্যাগ থেকে একটি বই বের করলো।

"এই নিন। পড়ে ফেরত দিয়ে দিয়েন।"

বুঝলাম না অপরিচিত একটা মেয়ে আমাকে বই সাধছে নেওয়ার জন্য। আমি মেয়েটির হাত থেকে বইটি নিলাম। উল্টিয়ে দেখলাম।

"আমি যদি বই না নিয়ে ফেরত দেয়?"

"তাহলে একটা কাজ করুন। আমাকে আপনি আপনার বইটি দেন আর আমার থেকে এই বইটি আপনি নেন। অগাথা ক্রিস্টির হিকোরি ডিকোরি ডক পড়েছিলাম। ভীষণ বোরিং লেগেছে। এখন এটা পড়ে দেখি কেমন লাগে।"

এরকম মেয়েরা এমন বাচাল হওয়া মানাই না। এরা হবে গম্ভীর। ছেলেদের সাথে কথা বলবে কম। পাব্লিক প্লেসে কথা তো বলবে না। পানি খাবে মুখোশের ভিতর দিয়ে। ক্যাফেটেরিয়ার কোনার চেয়ারে বসবে। অথচ এই মেয়েটার মধ্যে ওই বৈশিষ্টগুলির একটা বৈশিষ্ট নেই।

"কি ভাবছেন? ফেরত দিবেন কিভাবে সেটা ভাবছেন? রোকেয়া হলের সামনে এসে কাওকে বললেই হবে রুম নং ৩১২ নং এর এশাকে খবর দিতে।"

সেদিন এর পর থেকে আজ এশার সাথে আমার বই বদল কার্যক্রম চলতে লাগলো। সেই অনুযায়ী সেদিন ও ভিসিতে অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রত্যেক শুক্রবারে বিকাল ৩ টায় আমাদের বই বদল হতো। আমি অনেকদিন দেরিতে যেতাম। কিন্তু এশা এই নিয়ে কখনো বিরক্ত হতো না। আমাদের মধ্যে বেশি কথাও হতো না। কুশল জিজ্ঞাসা করতাম। বই বদল করতাম।

সেদিন আমি আগেই চলে আসছিলাম। ভিসিতে উল্টিয়ে উল্টিয়ে ডপনে ড্যু মরিয়ের "রেবেকা" দেখছিলাম। সেদিন এশার জন্য এটা নিয়ে গিয়েছিলাম। হঠাত করে দেখি হাকিম,ফারজানা আর সারদা আসছে এদিকে। তিনরথ একসাথে। নিশ্চয় কিছু সিরিয়াস ইস্যু চলছে। ওরে রাস্তার ওপাশ দিয়ে বটতলার দিকে যাচ্ছে।

"এই হাকিম" আমি ডাক দিলাম। সারদা দাঁড়িয়ে গেল। হাকিমকে সারদা দাড়াতে বলল। এবার তিনজন আমার দিকে তাকালো। আমি এগিয়ে গেলাম তিনজনের কাছে।

"তিন রথীর কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

"তুই এখানে কি করছিস ?" সারদা প্রশ্ন করল।

"তোরা একসাথে কই যাচ্ছিস?"

"একটু টিএসসি যাচ্ছি" হাকিম বলল।

"সারদা তুই এদের সাথে কি করিস?"

"এরাও প্রেম করতে যাচ্ছে আমিও ওর সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। তোর মত সারাজীবন একা পার করবো নাকি?"

"ওহ,আচ্ছা যা"

"চল তুই ও" সারদা বলল।

"এই তুমি এখানে?"

আওয়াজ শুনে পিছনে ফিরে দেখি একটি মেয়ে দাঁড়ানো। বাদামী রঙ এর একটা শাড়ি কুচি দিয়ে পড়ে আছে। মাথায় স্কার্ফ বাধা। গায়ের রঙ দুধের মত সাদা। চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হয় সৃষ্টিকর্তা হরীণির চোখ দিয়েছে উনাকে। ঠোট গোলাপি,কোন লিপস্টিক নেই। ঠোটের নিচে ছোট একটি তিল। যে কারও দৃষ্টি মেয়েটির দিকে ফেরানোর জন্য মেয়েটির ওই তিলটিই যথেষ্ট। মেয়েটি রাস্তায় দাঁড়ানো। আমি ভাবলাম হয়ত হাকিমকে বলছে।

হাকিমের দিকে তাকিয়ে দেখি হাকিম ও হা করে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটি ছিলই এত রূপবতী যে কোন ছেলেই মেয়েটির দিকে তাকাতেই বাধ্য। ভাগ্যিস ফারজানার দৃষ্টি ও মেয়েটির দিকে। নাহয় হাকিমের হা করে তাকানো দেখলে ফারজানা হয়ত এখানেই দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতো।

"আপনি ?" সারদা প্রশ্ন করলো।

"ওহ,আমি এশা।"

নাম শুনেই চমকিয়ে গেলাম। গত কয়েকমাস যাবত এশার সাথে মাসে তিন-চারবার দেখা করলাম অথচ মেয়েটিকে চিনতেই পারলাম না। কি করে চিনবো,এশার মুখ আগে কখনো দেখা হয় নি। আগে দেখলে হয়ত এশার প্রেমে পড়ে যেতাম।

"ওহ তোদের বলা হয় নি। এই হচ্ছে এশা। আর এশা এরা হল আমার বন্ধু" আমি পরিচয় করিয়ে দিলাম।

"চলো বসি" এশা বলল। যাক এই শুক্রবারটা না ঘুমিয়ে কাটিয়ে এই রূপবতী মেয়েটার সাথে আড্ডা মেরে কাটাই সেটাই ভালো।

"তোরা যা" আমি তিনজনকে বললাম। হাকিম আর ফারজানা সামনের দিকে পা বাড়ালো। কিন্তু সারদা সবাইকে চমকিয়ে দিয়ে নীলক্ষেত এর দিকে রওনা দিলো। কিছুই বুঝতে পারলাম না। ফারজানাও সারদাকে অনুসরণ করলো। হাকিম আমার দিকে অগ্নি দৃষ্টি দিয়ে টি এস সির দিকে রওনা দিল। কিছুই বুঝতে পারলাম না কি ঘটলো।

সেদিন এর পর সারদার দেখা পাইনি প্রায় এক মাস। নিয়মিত ওর হলে এসে খোঁজ দিতাম। ওর ডিপার্টমেন্টেও গিয়েছি কয়েকবার। কিন্তু ওর দেখা পাই নি। ঘটনার পর নিয়মিত কলা ভবনের এদিকে আসতাম সারদার জন্য। একদিন ডাকসুতে এসে হাকিম আর ফারজানার সাথে দেখা। দুজনে চুকিয়ে প্রেম করছে। ফারজানা সারদার ক্লাসমেট। ওর থেকে সারদার খবর জানার জন্য এগিয়ে গেলাম।

"প্রেম তো ভালই করা হচ্ছে?"

দুজন আমার কথা শুনে আমার দিকে তাকালো।

"আসসালামু আলাইকুম ভাই" ফারজানা সালাম দিল।

"অলাইকুম আসসালাম।"

"ভাই আপনারর সাথে দেখা করতে হলে যাচ্ছিলাম।"

"হঠাত হাকিম ছেড়ে আমার খোঁজ করছো। ব্যাপার তো সুবিধার মনে হচ্ছে না।"

"অসুবিধা আপনি করে ফেলেছেন?"

ফারজানার কথায় কিছু বুঝলাম না। চেয়ার টেনে বসলাম। বিষয়টা সিরিয়াস মনে হচ্ছে।

"বুঝলাম না। একটু বুঝিয়ে বলো?"

"সারদাকে আপনি এইভাবে হার্ট করতে পারলেন।"

"কি বলছো তুমি এসব? আমি সারদাকে হার্ট করলাম কি করে?"

"আচ্ছা আগে বলেন তো সারদা আপনার কি হয়?"

"বন্ধু"

"বন্ধু?" ফারজানা বিদ্রুপের হাসি দিয়ে বলল।

"আর আপনি জানে আপনি সারদার কি হন?"

"বন্ধু"

ফারজানা আমার কথা শুনে আবার বিদ্রুপের হাসি দিল। সেই হাসিতে আমার জন্য তীব্র ঘৃণা আর বিদ্রুপ দেখতে পেলাম।

"আমি জানিনা ভাই কোন মেয়ে তার বন্ধুর সাথে অভিমান করে দিনের পর দিন না খেয়ে থাকে। কোন মেয়ে তার বন্ধুর জন্য নিজের পরিবারের সাথে ঝগড়া করে। আমি সত্যিই জানিনা ভাই কোন মেয়ে নিজের বন্ধুর জন্য বাজার করে নিজে রান্না করে নিজে না খেয়ে বন্ধুর জন্য তুলে রাখে। ভাই আপনি বলেন কোন মেয়ে নিজের বন্ধুর টিউশনির টাকা দিয়ে পাঞ্জাবি কিনে?"

আমি সত্যিই বুঝতে পারলাম না ফারজানার কথা। চুপ করে থাকলাম।

"আচ্ছা বলেন তো আপনি সারদার সম্পর্কে কতটুকু জানেন? আর ক দিন ই বা ওর খোঁজ নিয়েছেন?"

আমি মনে করতে লাগলাম ওর সম্পর্কে কতটুকু জানি। না ওর নাম ছাড়া কিছুই মনে আসছে না। আসলেই তো কিছুই জানা হয়নি। এই চার বছরে আমি সারদা সম্পর্কে কিছুই জানিনা ওর নাম ছাড়া।

"আপনাকে প্রথম দেখেই সারদা আপনার প্রেমে পড়ে। মনে পড়ে সেদিনের কথা যেদিন আপনি হাকিমের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেন? সেদিন আপনারা চলে যাওয়ার পর সারদা ছুটে আসে আমার কাছে। ক্লাস শুরু হওয়ার পর থেকে সারদা সবার মত চলতো না। একা বসত। কারও সাথে কোন কথা বলত না। সবাই সারদাকে অন্যরকম ভাবত। আমিও অবাক হলাম যখন সারদা আমার কাছে এসে নিজ থেকেই জিজ্ঞেস করলো ,ছেলেটা কে?"

"সারদাকে আগে থেকে চিনো তুমি। সারদা যে বলল ও দর্শন বিভাগের?"

ভাই আমার কথা শেষ করতে দেন। আমি প্রথম ভেবেছিলাম হয়ত হাকিমের কথা জিজ্ঞেস করছে। না তারপর সারদা জিজ্ঞেস বলল "ওই যে হলুদ টি-শার্ট পড়া ছেলেটা।"

তারপর বুঝলাম আপনার কথা বলছে। আমি বললাম আপনার কথা। আপনার নাম আমিও জানতাম না। সারদা ক্লাশে সবচেয়ে অদ্ভুত মানুষ ছিল। সবসময় একা বসতো। কারও সাথে কথা বলত না। একা একা গান গাইতো। কিন্তু সেদিনের পর থেকে সারদা ক্লাশে আমার সাথে বসা শুরু করলো। আস্তে আস্তে দুজন খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেলাম। সারদা সব কথা শেয়ার করতে শুরু করলো। সেদিন আপনি বই ভুল করে ফেলে যান নি বইটি। আপনি যখন হাকিমের সাথে কথা বলছিলেন তখন সারদা বইটি তুলে নিয়ে গিয়েছিল। পরে যাতে এই অজুহাতে আপনার সাথে দেখা করতে পারে। সারদা যখন জানতে পারল হাকিম আপনার বন্ধু তখন থেকে সারদার জোরাজুরিতে আমিও হাকিমের সাথে কথা বল শুরু করলাম। হাকিম থেকে আপনার সম্পর্কে খুটনাটি জেনে সারদাকে বলতে লাগলাম। এদিকে হাকিম আমাকে প্রপোজ করে দেয় আর অন্যদিকে সারদা আপনার প্রপোজের আশায় দিন কাটায়। আপনি জানেন সারদার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে? না এসব আপনার রাখার সময় কই? আপনি তো এশার

সাথে প্রেমে মগ্ন। সেদিন বিকেলে আপনি এশার সাথে সুন্দর ,রোমান্টিক সময় কাটিয়েছেন অন্যদিকে সারদা তার চোখের জল ভাসিয়েছে।

আপনার জন্য সারদাকে বাসা ছাড়তে হয়েছে। আপনি হাকিমের সাথে চট্টগ্রাম যাবেন। হাকিম আমাকেই আগেই জানাই। সারদা সেই বিকেল থেকে আপনার জন্য রুটি আর হালুয়া বানিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। আমাদের হোস্টেলের নিয়ম তো জানতেন যে ১০ টার পর হোস্টেল থেকে বের হওয়া নিষেধ। সারদা জানত না আপনি আসবেন কি না। তবুও আপনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

দারোয়ান এসে খবর দেওয়া মাত্রই সারদা নিচে গেল। ফলাফল দুদিনের মধ্যে তাকে নিয়ম ভাঙ্গার জন্য হোস্টেল ছাড়তে হলো।
আচ্ছা সেদিন না হয় বুঝলেন না। যেদিন অসুস্থ হয়ে হসপিটালে পড়েছিলেন সেদিন যে সারদা আপনার জন্য চোখের জল ফেলেছে আপনি সেটা বুঝেন নি? আমি সেদিন হসপিটালের বাইরেই বসা ছিলাম যখন সারদা কাঁদতে কাঁদতে বের হলো। জানেন আপনি যতদিন হসপিটালে ছিলেন সারদা ততদিন সকাল-সন্ধা উপবাস করে কাটিয়েছিলো।

সেদিন সারদা দুপুরেই আমার কাছে চলে যায়। সারদা আর আমি প্ল্যান করি আমরা একসাথে ঘুরবো। হাকিম আগেই চলে যায়। প্ল্যান ছিলো আমি আর সারদা গিয়ে টিএসসিতে বসবো আর হাকিম যাবে আপনাকে খুঁজে আনতে। অথচ আপনি সেদিন এশার সঙ্গে.....

সন্ধায় ফিরে দেখি সারদা আমার রুমে দরজা বন্ধ করে আছে। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর ও দরজা খুলে। ওর দিকে তাকিয়ে দেখি ওর চোখ মুখ ফোলা। আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করলো। অনেক কষ্টে ওর কান্না থামালাম । জানেন সেদিন ও আপনাকে প্রপোজ করতো। ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রফেসরের কাছে। ও জানত এই সমাযে দুটি ভীন্ন ধর্মের লোককে কেউ একসেপ্ট করবে না। ও তো দুই বছর আগেই আপনার জন্য মুসলিম হয়ে গেছে। এটা নিশ্চয় আপনার জানা ও মুসলিম। অবশ্য এটা আমি ছাড়া আর কেউ জানতো কিন্তু আপনার তো জানার কথা। ও ফ্যামিলির জোরাজুরিতে এনগেজড হয় লোকের সাথে তবে ফ্যামিলি থেকে সময় নেই গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত। ওর প্ল্যান গ্র্যাজুয়েশন এর আগেই আপনাকে বিয়ে করবে। সে আশায় টাকা সঞ্চয় করা শুরু করে। অথচ আপনি তো বিয়ে করার সপ্ন দেখছেন অন্য কাওকে।

এখনো কি বলবেন আপনি সারদার শুধু বন্ধু। আপনি জানেন সারদা এতিম? তার বাবা-মা ,ভাই-বোন কেউ বেঁচে নেই। দূর সম্পর্কের চাচার কাছে মানুষ হয়েছে। ভাই আপনি সারদার সব বুঝলেন!"

ফারজানার কথা শুনে আমার পরিচিত জগতটা ভেঙ্গে গেল সেদিন। সারদা আমাকে ভালবাসে! মেয়েটা এত ভালবাসে আমাকে অথচ মেয়েটাকে এত কষ্ট দিলাম আমি। গত চার বছর ধরে এটাই ভাবতাম যে মেয়েটাকে শুধু আমিই ভালবাসি। সম্পর্কটা একতরফা। সারদাকে হারানোর ভয়ে কোনদিন সত্যি কথাটা বলতে পারেনি। কোনদিন বলতে পারিনি যে সারদা তোমার হাত ধরে আমি বৃদ্ধ হতে চাই। তোমার কোলে মাথা রেখে আমি মরতে চায়। শুধু ওকে হারানোর ভয়ে।

"ফারজানা এশাকে নিয়ে তোমরা ভুল বুঝছো। ও বিবাহিত মেয়ে। ও আমার ভালো বন্ধু।"

সেদিন এশার বিয়ে হয়। নিজে সাক্ষী থেকে বিয়েটা আমি করিয়ে দেয়।

"মানে ও আপনার প্রেমিকা না?"

" কি বলছো এসব? আমিত সারদাকে ভালবাসি।"

আমার কথা শুনে ফারজানা হাকিমের দিকে তাকালো।

"কি বলি নাই তোমারে। তোমার বান্ধবী যতটুকু আমার বন্ধুরে ভালবাসে তার থেকে আমার বন্ধু তোমার বান্ধবিরে ভালবেসে। এতদিন তো আজাইরা আমার উপর ঝাল ছাড়ছো। তো এখন সত্যিটা বলে দেয়?" হাকিম ফারজানার দিকে তাকিয়ে বলল।

"তোমরা ছেলেরা কখনো মেয়েদের মন বুঝবা না" হাকিমকে মুখ ভেঙ্গচিয়ে ফারজানা বলল।

"এই গাধা তুই কখনো সারদার তথাকথিত প্রেমিককে দেখছিস?"

সারদার সাথে দেখা হওয়ার পর থেকে তার প্রেমিকের নাম শুনে আসছি। কিন্তু এখনো একবার দেখা পেলাম না।

"এত ভাবতে হবে না সারদার কোন প্রেমিক নেই। ও শুধু তোকেই ভালবাসে। আর সারদা তোর যাস্ট ফ্রেন্ড না বুঝলি।"

“ফারজানা তুমি সারদার ক্লাসমেট এটা জানি রুমমেট যে আজ জানলাম আর হাকিম তুই শালা তো একদম বাশ দিলি।”

“কি করবো প্রেমিকার কসম কিছু বলতে পারবো না। তুই যে এতটা গাধা এটা কে জানে!”

দশ

"বললা না যে সারদা কে?" মজিদ ভাইয়ের কথা শুনে চিন্তার জগত থেকে ফিরে আসলাম। আকাশে বিদ্যুত চমকাচ্ছে। একটু পর প্রবল বৃষ্টি আসবে।

"সারদা আমার কেউ না?"

"মানে?"

"আচ্ছা মজিদ ভাই বৃষ্টিতে ভিজবেন?"

"না রে ভাই। বৃষ্টিতে ভিজলে জ্বর আসে।"

"আজ ২২ শে শ্রাবণ। আজ বৃষ্টিতে ভিজবেন না?"

"২২শে শ্রাবণ কি?"

মজিদ ভাইয়ের কথা শুনে আহত হওয়া ছাড়া কোন গতি নাই। বিশ্বাস করা যায় এটা বাংগালি হয়ে জানেনা রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু দিবস কবে।

"ভাই আজ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু দিবস।"

"ওহ।"

"আচ্ছা বললে না যে সারদা কে?"

সারদাকে ইগনোর করা আমার উচিত হয় নি। সেদিন সারদাকে সত্যি কথাটা বলতাম। জীবনে কখনো সিরিয়াস হয় নি। সারদার জন্য সিরিয়াস হওয়া শুরু করেছি। যেদিন জানতে পারলাম ও আমাকে ভালবাসে ওর পর থেকে শুধু প্রতিনিয়ত ওকে নিয়ে পড়ে থাকতাম।

আগে ওকে নিয়ে ভাবতাম কিন্তু ওর বয়ফ্রেন্ড আছে এ ভেবে ওকে ভাবনার জগত থেকে দূরে সরিয়ে রাখতাম। কিন্তু এখন ওকে ইচ্ছে করেই দূরে সরিয়ে রেখেছি।

গত ২০ দিনে ১৫ টা ছবি বিক্রি করেছি। জীবনে এই পর্যন্ত আকা ছবি ছিল এগুলো। কখনো বিক্রি করার উদ্দেশ্যে আঁকেনি ছবিগুলা। সেলারে পড়ে ছিল। যাক এখন কাজে লেগেছে। নিওমার্কেটে ৫০০-২০০০ টাকা

করে কাল সেল দিলাম সবগুলো। হয়ত নিজের নাম থাকবেনা ছবিগুলুতে কিন্তু এই জন্য আমার আফসোস নেই। পঁচিশ হাজার টাকা টোটাল বিক্রি করেছি। ওকে ইগনোর না করলে হয়ত এগুলা করা হত না। ওকে নিয়ে ব্যস্থ থাকতাম।

তিন হাজার টাকা দিয়ে এশাকে সঙ্গে নিয়ে একটা বেনারসী শাড়ি কিনলাম। সাত হাজার টাকা দিয়ে একটা ছোট আঙ্গটি। এশার কাছে এগুলো জমা আছে। বাকী টাকা তুলে রাখলাম। বাবার জন্য একটা পাঞ্জাবি কিনবো আর মায়ের জন্য ভালো জামায়ানি শাড়ি। ভিয়া আর ভাবীর বিয়েতে কিছুই দেওয়া হয়নি। ওদের জন্য কিছু কিনবো। সারদাকে নিয়ে এগুল কিনবো। তার আগে বিয়েটা সেরে ফেলব।

সারদাকে কাল সারপ্রাইজ দিবো। একগোছা কাঠগোলাপ নিয়ে সোজা ওর হলের সামনে হাজির হবো। নিজে পড়বো ওর দেয়া হলুদ পাঞ্জাবিটা। বিয়ে করতে যাবো হলুদ পাঞ্জাবি পড়ে কেমন একটা অদ্ভুত দেখাবে। তবুও ওইটা পড়ে যাবো। হাকিম আর ফারজানাকে কাজী অফিসে আগেই পাঠিয়ে রাখবো। সাথে থাকবে এশা।

সারদার সামনে হাটু গেরে কাঠ গোলাপ গুলো ধরে বলব "উইল ইউ মেরি মি?"

সারদা আমার দেওয়া লালশাড়িটা পড়বে। বেলী ফুল কিনে নিয়ে যাব ওর মাথায় দেওয়ার জন্য।

দুজনে বিয়েটা সেরে নিবো। তারপর আম্মা-আব্বা আর ভাইয়া-ভাবীর জন্য কেনাকাটা করবো। সন্ধায় ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরবো। সন্ধ্যায় নর্মালি দরজা খুলবে আম্মা। সেই সময় বাবা নাক ডেকে ঘুমাবে ভাবী নিজ রুমে ব্যস্ত থাকবে আর ভাইয়া হসপিটালে।

আম্মা দরজা খোলা মাত্রই সারদাকে নির্দেশ করবো আম্মার পা ছুয়ে সালাম করতে। সারদা সালাম করবে। আম্মা চমকে যাবে সাথে অবাক ও হবে।

"আম্মা এই তোমার ছেলের বউ। যৌতুক হিসেবে তোমাদের জন্য শপিং করে নিয়ে আসলাম।"

আম্মা দরজা থেকে সরে দাঁড়াবে। হয়ত নতুন বউকে বরণ করার জন্য ব্যস্থ হয়ে পড়বে নয়ত রাগ বসে থাকবে। ডাকাডাকি করে সবাইকে আনবো। বাবা মুখ ভাড়ি করে জিজ্ঞেস করবে "মেয়েটা কে?"

আমি বলবো "বাবা আপনার মেয়েই ধরে নিন।"

সারদা এগিয়ে গিয়ে বাবাকে সালাম করবে। বাবা খুশি হবেন। কারণ তিনি অল্পতে অখুশি কিংবা দুঃখী হয় না। ভাবি ব্যস্থ হবে নতুন বউকে বরণ করতে। আম্মা তার রাগ কমিয়ে ভাবীর সাথে যোগ দিবে। ভাইয়াকে ভাবী ফোন দিবে। ভাইয়া হসপিটাল থেকে ছুটে আসবে। আমার কান ধরে মলা দিয়ে বলবে "বিয়ে করেছিস ভালো বড় হয়ে গেছিস। একবার জানাতেও পারলি না?"

আমি ভাইয়াকে হেসে জবাব দিবো "আরেকবার করিয়ে দাও। সবাই জেনে যাবে।"

তারপর কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবো সারদা আমার বউ। আচ্ছা এখন মজিদ ভাইকে এটা বলে চমকে দেওয়া যাক।

"ভাই সারদা আমার বউ।"

মজিদ ভাই আমার কথা শুনে ব্রেক ধরে ফেলল। মজিদ ভাইয়ের শক খাওয়ার কথা না। কারণ ভাইকে কখনো উত্তেজিত হতে দেখিনি। খুব ধৈর্য সহকারে উনি সবকিছু হ্যান্ডেল করে। ঠান্ডা মাথার মানুষ। একদম গোয়েন্দা উপন্যাসের গোয়েন্দার মত।

"ভাই কি হলো?"

"এসে পড়েছি।"

ভাইয়ার কথা শুনে তাকিয়ে দেখলাম এক হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। গেটের সামনে লেখা

আল ফালাহ হসপিটাল

১২/বি,বি ব্লক

রোড নং-৭,উত্তরা।

অবাক হলাম। সারদা আমাকে হসপিটালের এড্রেস দিল কেন? বিশাল হসপিতাল। সমস্ত হসপিটাল সাদা রঙ এর পেইন্ট করা। হসপিটালের সামনে সুন্দর একটি ঝারুল গাছ। একদম গেইট ঘেষেই। জায়গাটে অনেক পরিচিত মনে হল্ল। মনে হয় অনেকবার এসেছি এখানে কিন্তু মনে করতে পারছি না কবে এবং কখন এসেছি। মনে করার চেষ্টা করলাম। চিন চিন করে প্রচন্ড মাথা ব্যাথা শুরু হলো। মনে হচ্ছে মাথার মাঝখান দিয়ে কেউ লোহার রড ঢুকিয়ে দিয়েছে। যন্ত্রনায় চোখ দিয়ে পানি পড় শুরু করলো। আমি চোখ বুঝলাম।

চোখ বুঝতেই চোখের সামনে ভেসে উঠলো সারদার মুখ। সেই আগের মত চোখে চিকন গাঢ় কাজল,কপালে ছোট একটি টিপ আর হাতে বাহারি রঙ এর চুড়ি। সারদা সেই জগত ভুলানো হাসি দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। চোখের তার দুষ্টুমি খেলা করছে। সারদার উপস্থিতি যেন আমার মাথার ব্যথাটাকে কমিয়ে দিল।

"এই তোমার কি হয়েছে?" চোখ খুলে দেখি মজিদ ভাই আমাকে হাত দিয়ে ঠেলছে।

"কতক্ষণ যাবত তোমাকে ডাকছি। কি হয়েছে তোমার? তুমি ঠিক আছো?"

"ভাই কিছু হয় নি" আমি বইগুলা নিয়ে গাড়ি থেকে নামলাম। ফাইনালি রবীন্দ্রনাথ তার ঠিকানায় পৌছাতে যাচ্ছে। সারদার কাজ বুঝিয়ে দিতে পারছি। কিন্তু বুঝতে পারলাম না।

"একটু দাঁড়াও। গাড়িটা পার্ক করে আসি। খবরদার আমাকে ছাড়া ভিতরে ঢুকবা না" মজিদ ভাই চোখ রাঙ্গিয়ে বলল।

বুঝলাম না মজিদ ভাই এমন অদ্ভুত ভিহেব কেন করল। ভেবেছিলাম মজিদ ভাই আমাকে ড্রপ করে চলে যাবে। কিন্তু উনিও এখানে আসছে। হঠাত করে বিদ্যুত চমকিয়ে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়া শুরু করল। যাক ইন্দ্রদেব ফাইনালি শুরু করেছেন।

"চলো" মজিদ ভাই বলে ভিতরে হাটা দিলেন।

"কার কাছে যাচ্ছি আমরা?"

আসলেই তো,সারদা যাস্ট এড্রেস দিলো বাড়ির কারও নাম তো বলল না। মেয়েটা আজ ঝামেলায় ফেলে দিল। রবীন্দ্রনাথকে আমার সাথে জুড়ে সমস্ত দিন মাটি করে দিলো। ভিতরে গিয়ে খোঁজ করতে হবে।

"আজ কত বছর পর দেখা। কি চাকরি করছো। ছেলে সন্তান কয়টা?"

আজব ভাই এমন মশকারি করছে কেন! মজিদ ভাইয়ের সাথে দেখা মাত্র দু' বছর আগে। ভাইয়া কি এত তাড়াতাড়ি সব ভুলে গেল। গ্র্যাজুয়েট ই হতে পারলাম না আবার চাকরি।

"ভাই কি মশকরা করছেন ?"

ভাই হেটে রিসিপশনের সামনে চলে গেল।

"আজব মশকরা কেন করবো।"

"ভাই গ্র্যাজুয়েশন করতে পারলাম না আবার চাকরি?"

"এই পাঁচ বছরেও কি গ্র্যজুয়েশন করতে পার নাই?"

পাঁচ বছর মানে? মজিদ ভাই তো ছেড়ে গেল আজ দুই বছর হল। উনি দুই বছরকে পাঁচ বছর বানিয়ে ফেললেন কি করে। ভাই আমার সাথে কি শুরু করলো এসব।

"ভাই এসব কি বলেন আমিতো ফোর্থ ইয়ারেই।"

"আমি গ্র্যাজুয়েট হইছি যখন তুমি ফাস্ট ইয়ারে। আর আমি গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করছি আজ পাঁচ বছর হলো।"

"ভাই দুই বছর হলো।"

"তুমি ঠিক আছো তো। তোমাকে দেখে আমার এবনর্মাল মনে হচ্ছে।"

আমি মজিদ ভাইয়ের কথায় কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমাকে অস্বাভাবিক লাগছে! কিছুই বুঝতে পারছে না। ভাইয়ের গ্র্যাজুয়েশন হল দুই বছর আর ভাই তা করে ফেললেন পাঁচ বছর।

"ভাই আপনি তো এক্সট্রিম লেবেলের রসিকতা করছেন।"

মজিদ ভাই আমার কথা শুনে চোখ সরু করে ফেলল।

"জানো এটা কত সাল চলে?"

"জানবো না কেন এটা ২০০৫ চলে।"

মজিদ ভাই আমার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। আমার হাত ধরে রিসিপশনের পাশের চেয়ারগুলির কাছে নিয়ে গেলেন। জোর করে বসালেন।

"এখানে বসে থাকো। তুমি যেই কাগজটা দিছো সেটাতে কিছুই লেখা নাই" মজিদ ভাই তার পকেট থেকে কাগজটা বের করে দিলেন। আমি কাগজটা হাত থেকে ছু মেরে নিলাম। আমি খুলে দেখলাম

বইগুলি এই এড্রেসে পৌছিয়ে দিস,বা১২সা /বি,রোড নং -৭ বি ব্লক উত্তরা। যাতায়াত খরচ বাবদ পাঁচশত টাকা দিলাম।

"ভাই এখানে তো এড্রেস লেখা আছে" আমি কাগজটা মেলে ধরে মজিদ ভাইকে বললাম।

মজিদ ভাই কাগজটার দিকে তাকিয়ে আতংকিত হয়ে গেল। উনি আবার কাগজটা আমার হাত আবার নিয়ে নিলেন। আবার কি মনে করে আমার হাতে দিয়ে দিলেন।

"আচ্ছা তোমার বাসার নাম্বার দাও তো একটু।"

"০৪৩৪৭৭৪৮"

" ভাই বাসার নাম্বার কেন?"

"এটা কার নাম্বার?"

"ভাইয়ার।"

"ওহ,বাসার নাম্বার মনে নেই?

বাসার নাম্বার মুখস্ত করা হয় নি। বাবার অভ্যাস ঘন ঘন নামবার চেঞ্জ করা। ভাইয়া অফিসে চাকরি পাওয়ার পর ভাইয়ার নাম্বার মুখস্ত করে ফেলি, পার্মানেন্ট নাম্বার। কারও প্রয়োজন হলে এই নাম্বার দেয়।

"তোমার ভাইয়ার নাম কি?"

"আদনান হোসেন।"

"আর তোমার বাবার নামটা যেন কি?"

"আফজাল হোসেন।"

"আচ্ছা তুমি এখানে বসো একটু। আমি একটু আসি" মজিদ ভাই রিসিপসনিস্টের দিকে এগিয়ে গেল।

রিসিপসনিস্ট একজন মধ্যবয়সী পুরুষ। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। মনে হয় গতকাল শেভ করেছে। মুখে ছোট ছোট পাকা দাঁড়ি।বয়স বেশি হবে না। রিসিপশনিস্টের কাছে মজিদ ভাই যেতেই রিসিপশনিস্ট চশমার উপর দিয়ে মজিদ ভাইয়ের দিকে তাকালো। মজিদ ভাই রিসিপশনিস্টের দিকে মুখ করে কি যেন বলে আমার দিকে একবার তাকালো। আমি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সুন্দর করে বসে আছি। মজিদ ভাই আবার রিসিপশনিস্টের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

রিসিপশনিস্ট টেলিফোন এগিয়ে দিল মজিদ ভাইয়ের দিকে। মজিদ ভাই টেলিফোন হাতে নিয়ে তেলিফোন করা শুরু করল।

মজিদ ভাই উদ্ভট আচরণ করছে। দুই বছরকে পাঁচ বছর বানিয়ে দিয়েছে। রিসিপসনিস্টের মাথার উপর একটি ক্যালেন্ডার ঝুলছে। দূর থেকে ভালো করে দেখতে পাই না। চোখ যেতে শুরু করেছে। শিঘ্রয় ভাইয়ার মত চশমা নিতে হবে। বাইরে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। ডেট টা দেখে বাইরে যাবো বৃষ্টিতে ভিজবো। মজিদ ভাইয়ের মশকরাটা ছুটিয়ে আসি আগে।

মজিদ ভাই টেলিফোনটা রেখে দিয়ে আমার দিকে তাকালো। উনার মুখে বেদনার ছাপ। উনি রিসিপশনিস্টকে কি জানি বলল। রিসিপশনিস্ট দ্রুত টেলিফোন লাগাল।

আমি এগিয়ে গিয়ে ক্যালেন্ডার দেখলাম। ক্ল্যালেন্ডারে বড় করে লেখা 'ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড।' তার একটু নিচে বিশাল এক মসজিদের ছবি। তার নিচে কালো করে লেখা

২১ জুন ২০১০,২২ শে শ্রাবণ ১৪১৩

ক্যালেন্ডারে ডেট দেখার পর আমার মাথা চক্কর দিচ্ছে। তারমানে মজিদ ভাই ঠিক বলছে। যদি মজিদ ভাই ঠিক বলে থাকে তাহলে এই পাঁচ বছর আমি কই ছিলাম। আর আজ সকালে সারদার দেওয়া চিঠি। চিঠির কথা মনে হতেই হাত থেকে চিঠিটা খুলে ধরলাম। চিঠিতে কিছুই লেখা নেই। একদম ব্ল্যাংক। কি ঘটছে এসব। আমার মাথা ধরে আসছে। চারপাশ মনে হচ্ছে চোখের সামনে ঘুরছে। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।নিঃশ্বাস কেমন যেন বন্ধ হয়ে আসছে। আমি দ্রূত হসপিটাল থেকে বের হয়ে গেলাম। পিছন থেকে অনেকগুলো আওয়াজ শুনলাম। মনে হলো অনেকে দৌড়ে আসছে এদিকে। কে বা কারা আসছে তা আমার দেখার সময় নেই। পিছনে না তাকিয়ে আমি বের হয়ে গেলাম। বাইরে বৃষ্টি,তুমুল বৃষ্টি।

ঝুম ঝুম করে বৃষ্টি পড়ছে। সমস্ত কিছু ছাপিয়ে আমার কানে শুধু বৃষ্টি পড়ার শব্দ আমার কানে আসছে। বৃষ্টিতে বিজতে পারলেই এই যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পাবো।

আমি ব্যাগটা বারান্দায় রেখে রেখে বৃষ্টিতে ভিজতে লাগলাম। বৃষ্টি আমার দেহকে কিছুক্ষণ এর মধ্যে বিজিয় দিলো। আমার মনে হচ্ছে অনেকদিন পর বৃষ্টিতে ভিজছি। মাটি থেকে সুগন্ধ আমার নাকে আসছ।বৃষ্টির প্রত্যেক ফোটা পড়া মাত্রই আমার ঘুম আসতে লাগলো কিছুক্ষণ এর মধ্যে। চোখ বুঝে আসতে লাগল। মনে হচ্ছে অনেকদিন যাবত অনিদ্রায় আছি। ঘুম আসছে আমার,প্রবল ঘুম। আচ্ছা বৃষ্টিতে কেউ ঘুমায়? তাহলে আমার এত ঘুম আসছে কেন?

আজব এই বৃষ্টিতে কে আবার গুন গুন করে গান গাইছে । গলাটা চেনা লাগছে। হা সারদা,সারদা এখানে কি করে। চারপাশে দেখতে লাগলাম। কোথাও সারদাকে দেখতে পাচ্ছিনা। চারিদিকে শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি।

"আমাকে খুজছো তুমি তরুণ?"

"আমার নাম তরুণ? তরুণ কে?" চিৎকার করে বললাম। আমার নাম কি? আমার নিজের নাম মনে পড়ছে না। আর সারদা এই বৃষ্টিতে এখানে কি করছে?

"হা তুমি আমার তরুণ। আজ ২২ শে শ্রাবণ না আজ তো আমাদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল তরুণ।"

সারদা দূরে বসে আছে। ঝাপসা দেখতে পাচ্ছি আমি। মনে হচ্ছে পথম দিনের মত সারদা মাথা নুইয়ে বসে আছে। আমি সারদার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমার দুচোখ বুঝে আসছে আমার।

"সারদা তুই এখানে কি করিস?" অনেক কষ্টে বললাম।

সারদা নিরুত্তর। মাথা নিচু করে বসে আছে। আমি সারদার কাছে যেতে লাগলাম। আমার পা ধরে আসছে। আস্তে আস্তে সমস্ত কিছু অন্ধকার হয়ে আসছে। আমি তলিয়ে যাচ্ছি অন্ধকারে। জ্ঞান হারাচ্ছি আমি। সবকিছু আমার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। আমি কি মারা যাচ্ছি! জানিনা,কিন্তু অন্ধকারের গহহবরে তলিয়ে যাচ্ছি। শুধু কানের কাছে বাজছে .....

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে
হৃদয় রয়েছে গোপনে।
বাসনা বসে মন অবিরত
ধায় দশ দিশে পাগলের মত .....

এগারো

মজিদ সাহেব দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে তরুণ শুয়ে আছে। আজ দুই দিন পর তরুণের জ্ঞান ফিরে। সেদিন মজিদ সাহেব তরুণের দেওয়া নাম্বারটায় ফোন করে। নাম্বারটা ছিল ডাক্তার আদনান আহমেদের। আদনান আহমেদের কথা শুনে সেদিন চমকিয়ে যায় মজিদ সাহেব। নিজেই নিয়ে যায় আদনান সাহেবের কাছে। সাফিয়া মান্নান মানসিক হাসপাতালের। মজিদ সাহেব আগেই জানতো তরুণের কোন ভাই নেই আর তরুণের বাবার নাম আফজাল হোসেন না। কিন্তু উনি জানতেন না তরুণের এই অবস্থা যে।

আজ সবাই তরুণের পাশে আছে। হাকিম,ফারজানা এমনকি এশাও। কিন্তু সারদা নেই। তরুণের বাবা দাঁড়িয়ে আছে সবার থেকে একটু দূরে। উনার মাথায় ব্যান্ডেজ। তরুণ বসতে চেষ্টা করলো। কিন্তু মাথাটা প্রচন্ড ভারী। তরুণকে উঠতে দেখেই তার ভাবী এগিয়ে আসলো। তরুণ তার ভাবীকে দেখছে,শরীরে সাদা গাউন পড়া,বুকের উপরে নেইম প্লেটটাতে বোল্ড করে লেখা “ডাক্তার রাবেয়া খাতুন লুবনা।”

তরুণ দেখলো তার ভাবী এসে তাকে বালিশে শুইয়ে দিলো। তরুণ বুঝতেই পারছে না তার ভাবী শিক্ষকতা ছেড়ে ডাক্তার হলো কবে? তরুণের নজর পড়ল হাকিম আর ফারজানার দিকে। হাকিমের বয়স মনে হচ্ছে বেড়ে গেছে। হাকিম কত বদলে গেছে। তরুণ ভাবছে সকালে হাকিমকে কেমন দেখলো আর এখন হাকিম কেমন হয়ে গেল। কত বদলে গেল। ফারজানা আগের মতই আছে খালি একটু মোটা হয়ে গেছে। এশার পেত ফুলে গেছে। ওর প্র্যাগন্যান্ট নাকি।

"কেমন আছেন ভাই?" ফারজানা এজ ইউজুয়াল মুখে টোল পড়া হাসি নিয়ে বলল। কিন্তু ফারজানাকে ছাপিয়ে তরুনের সারদার কথায় মনে পড়ছে।

"ফারজানা সারদা কই? "

তরুণের কথা শুনার পর ফারজানা হাকিমের মুখের দিকে তাকালো। সবাই সবার মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। ফারজানা মুখ নিচু করে বের হয়ে গেল। তরুণ সবার দিকে একবার তাকালো।

"এশা তরুনের কাছে আসলো"

"তরুণ এশার দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দিলো। এশাও মুচকি হাসি দিয়ে বলল "মেয়ে হবে ভাই। নাম আমি ঠিক করে রেখেছি, সারদা। সারদা আবার ফিরে আসবে ভাই। দোয়া করবেন আমার মেয়ের জন্য তারেক ভাই।"

তারেক কে?আর সারদার কি হলো? এশা এসব কি বলছে!

"তারেক কে এশা? আর সারদার কি হয়েছে?"

এশা নিশ্চুপ। তরুণের দিকে একটু তাকিয়ে চলে গেল।

মজিদ ভাই ও আছে। ভাবলেশীন হয়ে তরুনকে দেখছে। সবাই আছে শুধু মা নেই। সারদা আর তরুণের মা কে তরুণ দেখতে পেলনা।

"ভাইয়া মা কই? আর বাবার কি হয়েছে?" তরুণ প্রশ্ন করলো।

"কিছু হয়নি? তুমি রেস্ট নাও" আদনান সাহেব বললেন।

আদনান বিছানার পাশে এসে বসলেন। লুবনাকে চোখ দিয়ে ইশারা করলেন। লুবনা পকেট থেকে একটি ট্যাবলেট এর বোতল বের নিল। খয়েরি রঙ এর বোতল। বোতল থেকে একটি ট্যাবলেট বের করে নিলেন। টেবিলের উপর থেকে এক গ্লাস পানিও নিয়ে নিলেন।

"তরুণ এই ঔষুধ টা খাও তো" লুবনা তরুণের কাছে এসে বলল। তরুণ শুয়ে থেকেই ট্যাবলেট টা খেলো।

"তরুণ,যাও তোমাকে আমি এই নামেই ডাকছি। তুমি গত পাঁচ বছর যাবত এই হসপিটালে ভর্তী। তোমার তা খেয়াল আছে?"

তরুণ তার ভাইয়ের কথা শুনে নিশ্চুপ হয়ে থাকলো। আজ এপ্রিল ফুল ডে নাকি! সবাই তার সাথে এমন করছে কেন?

তরুণ তুমি জানো তুমি কে? তোমার পরিচয় কি?" আদনান এর কথায় তরুণ চমকে উঠলো। নিজের বড় ভাই হয়ে নিজের ভাইয়ের পরিচয় জানেনা। রসিকতা করছে নিশ্চয়।

"রসিকতা করছো ভাইয়া?"

"আমি তোমার ভাই না তরুণ। আমি তোমার ডাক্তার তানভীর আহমেদ। আমি তোমাকে গত পাঁচ বছর ধরে ট্রিটমেন্ট করছি।"

তরুণ প্রচন্ড ব্যথা পেলও তার ভাইয়ার কথা শুনে। আর পাঁচ বছর! পাঁচ বছর কি করে সম্ভব। তরুণ তো গত একদিন আগে শ্রাবণের ২২ তারিখ সারদার চিঠি নিয়ে গেলো। সেদিন হাকিম এর সাথেও দেখা হয়।

"কি বলছো এসব! আর বাবা ভাইয়া এসব কথা কেন বলছে। আর হাকিম কাল ই ত তুই আমার পাঞ্জাবির প্রশংসা করলি। তোরা সবাইই কি আমাকে নিয়ে মজা করছিস নাকি?"

"তরুণ উনি তোমার বাবা নই,উনি চীফ সিকিউরিটি অফিসার মইনুল হোসেন আর তোমার বাবা তো তুমি যখন ক্লাস ফাইভে পড়ো তখন মারা যায়। তরুণ তুমি কি বুঝতে পারছো যে তোমার মানসিক অবস্থা ঠিক না? তুমি উনাকে দুই দিন আগে আহত করে হসপিটাল থেকে পালিয়েছো।"

তরুন নিশ্চুপ। তার মাথা প্রচন্ড ব্যথা করছে। মনে হচ্ছে ফেটে যাবে। কাল এরকম করছিল তরুণের মাথা।

"তরুণ তুমি জানো তোমার নাম কি?"

"তরুণ"

"না, তোমার নাম তারেক হোসেন। গত পাঁচ বছরে তুমি একটি নতুন জগত বানিয়ে নিয়েছো যেখানে তোমার নাম তরুণ। তরুণ ছিল তোমার ছোট ভাই যে পাঁচ বছর বয়সে পানিতে পড়ে মারা যায়। শুধু তুমি নিজেকে অন্য পরিচয় দাওনি তুমি তোমার আশেপাশে থাকা সবাইকে নিজের জগতে সামিল করেছ।

যেমন আমাকে ভাবছো তোমার ভাই আদনান চৌধুরি,মইনুল হোসেনকে তোমার বাবা ,সিন্থিয়া কে লুবনা। তারেক তুমি এমন একটি জগত তৈরি করেছ যেটা সবসময় তুমি কল্পনা করেছো। একতি পরিবার। তুমি নিজেই একটি কল্পনার জগত বানিয়ে আছো আর সেটার উপর ভর করে এই পাঁচ বছর আছো। তোমার তরুণ তুমি জানো তুমি একজন সিজোফ্রেনিক?"

তরুণ বসার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। মাথা তার প্রচন্ড ভারী। তার নাম কি আসলেই তারেক?

"হাকিম তুই কিছু বলছিস না কেন?"

"তরুণ হাকিম এই পাঁচ বছর ধরে তোমার ভরণপোষন করছে। ও আজ সকালে চট্টগ্রাম থেকে ফিরেছে। তোমার নাম তারেক। তুমি খুব অল্পবয়সে সব হারিয়েছো। সারদা নামক যেই মেয়েটা তোমার শূন্য জীবনে এসেছিল সেই মেয়েটাকে তুমি শ্রাবণের ২২ তারিখ মেয়েটাকে হারিয়েছো। এদিন তোমাদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল তারেক।"

"সারদা মরতে পারে না। আমি এখনো সারদাকে অনুভব করি। তুমি মিথ্যা বলছো" তরুণ চিৎকার করে উঠলো।

তরুণ সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করল বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াতে। কিন্তু তার সমস্ত তাকে সাহায্য করল না। ব্যর্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকলো। তরুণের দুচোখ বেয়ে পানি পড়ছে।

ফারজানা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। তরুণের চিৎকার শুনে বসে পড়লো। মুখ ডেকে কান্না শুরু করে দেয়।

আজ থেকে পাঁচ বছর আগে শ্রাবণের ২২ তারিখ তরুণ আর সারদার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাড়ি থেকে ফেরার পর সারদা এক্সিডেন্ট করে। তারপর থেকে তরুণ পাগল হয়ে যায়। কাঠগোলাপগুলু এখনো যত্ন করে সারদা রেখে দিয়েছে। সারদার শাড়িটাও এখনো ঝুলছে আলমারিতে। শুধু সারদা নেই।

"হাকিম আমার নাম কি তারেক?"

হাকিম চুপচাপ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

"এই নাও তোমার জাতীয় পরিচয়পত্র আর এটা ভার্সিটি কার্ড পাঁচ বছর আগের তোমার। তুমি যেই সারদার খোজ করছো সে শ্রাবণের ২২ তারিখ, ৬ আগস্ট২০০৫ সালে মারা যায়। তুমি যেই হসপিটালে গিয়েছিলে সেখানে তার লাশ নিয়ে যাওয়া হয়। আর এটা ২০১০ সাল। সারদা মারা যাওয়ার পর তুমি ট্রমাতে ছিলা। যখন ট্রমা থেকে রিটার্ন করলা তখন Post traumatic stress disorder এ ভুগতে লাগলা। তীব্র হ্যালুসিনেশন আর ড্যিলুশন এর কারণে সিজোফ্রেনিক হয়ে গেলা। তারেক তুমি সারদাকে না ছেড়ে দিলে ভালো হবা না। Let her go. You are actually living in fiction."

"আমি তরুণ না তারেক? আর সারদা সে কি শুধু কল্পনায় ছিল না বাস্তবে" তরুণের দুচোখ বেয়ে পানি পড়তে লাগলো। তরুণ তার অতীত সম্পর্কে কিছুই মনে করতে পারছে না। কোনটা বাস্তব আর কোনটা কল্পনা! সে বুঝতে পারছে না।

তরুণের হাতে তার জাতীয় পরিচয় পত্র যেখানে তার নাম লেখা তারেক হোসেন। তার জগতটা আয়নার মত ভেঙ্গে গেলো। মাথার মধ্যে চিনচিনিয়ে ব্যথা শুরু করলো। তীব্র ব্যথা। সে সারদাকে মনে করতে লাগলো। সারদার চেহারা তরুণের সামনে ভেসে উঠলো। সেই কাজল দেওয়া চোখ,কপালে ছোট একটি তিল,হাতে লাল-নীল চুড়ি। কিন্তু সারদার মাথায় সিঁদুরের পরিবর্তে যেনও রক্তের ফোয়ারা বইছে। রক্তগুলি সারদার সাদা শাড়িটাকেও লাল করে দিয়েছে।

এত রক্ত! তরুণ আর সহ্য করতে পারছে না। সে চিতকার করে উঠলো

"সারদা!সারদা! আমার সারদাকে বাঁচাও।"

তারেকের চিৎকার তারেকের কানেই ফিরে এলো প্রতিধব্বনি হয়ে। আবার তারেকের চোখ বুজে আসছে। সে আর চোখ খোলা রাখতে পারছে না। সবকিছু আবার অন্ধকার হয়ে আসছে। আস্তে আস্তে তারেক ঘুমিয়ে গেল ,হারিয়ে গেলো অন্ধকার রাজ্যে চিরতরের জন্য।

পুনশ্চ

২২ পৌষ,১৪১৭ বাংলা, ৫ জানুয়ারি ২০১০ সালে তারেকের মৃত্যু হয়। সেদিন তারেক কোমায় চলে যায় ইন্টার্নাল ব্লিডিং এর জন্য। তারেকের লাশটা নিয়ে যাওয়া হয় দেশের বাড়ি কুমিল্লায়। লাশের সাথে হাকিম

,ফারজানা ,মজিদ আসে। এশা আসতে পারেনি। এশা হসপিটালে ভর্তী। সে তার প্রথম সন্তানকে জন্ম দিবে।

ফারজানা কাঁদছে। তরুণের কবরের পাশে হাকিম দাড়িয়ে আছে। তার হাতে একটি বকুল ফুলের গাছ। নিজে খুরেই গাছটা লাগাবে সে। হাকিম কাঁদছে না। সে প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। যেই প্রতিজ্ঞা সে পালন করেই তরুণের জন্য চোখের পানি ফেলাবে। হাকিমের গায়ে তরুনের সেই হলুদ পাঞ্জাবীটা। খুব যত্ন করে হাকিম এটা তুলে রেখেছিল। তরুণকে মাটি দেওয়া হচ্ছে তরুণের মায়ের কবরের পাশে। হাকিম সমস্ত দায়িত্ব পালন করছে।

কবস্থান এর বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ডাক্তার তানভীর আহমেদ আর সোবহান সাহেব। সোবহান সাহেবের চেহারা ভাবলেশহীন। তার চোখ হাকিমের দিকে। হাকিম এখন মাটি খুঁড়ছে। ছেলেটাকে তার সুবিধের মনে হচ্ছে না। নতুন সরকার আসায় উনার অবস্থা ভালো যাচ্ছে না। নাহয় এই ছেলেটার ও কিছু একটা করে ফেলতো।

"যাক সব ভালোমত শেষ হলো। এবার আমার পেমেন্ট টা দিলে আমি চলে যেতাম।"

তানভীর সাহেবের কথা শুনে পকেট থেকে একটা চেক বের করে তানভীর সাহেবকে দিলেন। তানভীর সাহেব চেকটা উল্টিয়ে-পালটিয়ে দেখলো। পঞ্চাশ লাখ টাকার চেক। কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে মাত্র পঞ্চাশ লাখ টাকা তানভীর সাহেব পেল।

তারেককে খুব সহজেই ভাল করা যেত। কিন্ত সোবহান সাহেবের ডিল হয় তানভীর সাহেবের। পঞ্চাশ লাখ টাকার ডিল। পাঁচ বছর তারেককে শক ট্রিটমেন্ট দিয়ে পাগল করে রাখে সে। এই পাঁচ বছরে সোবহান সাহেব সবকিছু নিজের করে নিয়েছে। কিন্তু তানভীর নিজেও জানতো না তারেকের মৃত্যুটা এভাবে হবে। যাহক সবকিছু ইজিলি শেষ হয়ে গেল এটাই ভাল খবর।

"মেয়েটাকে আজ রাতের মধ্যেই শেষ করে দিবেন।"

"নিশ্চয়" তানভীর সাহেব হাসি দিয়ে।

"বিদেয় হোন" সোবহান সাহেব বলে বাড়ির দিকে হাটতে লাগলেন।

তানভীর সাহেব এর গাড়িটা রাস্তায় রাখা। কালো রঙ এর সেডান। বাইরে থেকে গ্লাসের ভিতর দিয়ে দেখা প্রায় অসম্ভব। সবার থেকে একটু দূরে। গাড়ির ভিতর থেকে দুখানা চোখ তরুণের কবরের দিকে। মেয়েটা শুধু কান্নায় করছে। গত পাঁচ বছর যাবত তানভীর মেয়েটাকে "এল এম এস ডি" দিয়ে মেয়েটার স্মৃতি নষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু আজ মেয়েটার চোখের পানি টপটপ করে পানি পড়ছে। তার স্মৃতির কোন কোনে এখনো তারেক নামের মানুষটা বেঁচে আছে। মেয়েটা এতই সুন্দরি যে মেয়েটাকে বন্ধী করে দিনের পর দিন ভোগ করেছে সে। মেয়েটার রূপে কোন ভাটা পড়েনি বাকী কয়েকটা দিন ভোগ করে ওকে মেরে ফেলতে হবে।

মজিদ সাহেব দূর থেকেই দেখছে সবকিছু। হাকিম গাছটা লাগিয়ে এইদিকেই আসছে। পকেট থেকে সিগারেট বের করে নিল মজিদ সাহেব। সিগারেট হাতে নিয়ে কয়েকবার দেখলো। তারপর আবার সিগারেটটা প্যাকেটে রেখে দিলো।

"খেলাটা শুরু করা যাক" হাকিম কাছে এসে বলল।

মজিদ সাহেবের মুখে ফুটে উঠলো এক সুক্ষ্ণ হাসি।